# একক ২ক ❑ সিন্ধু সভ্যতা/হরপ্পীয় সভ্যতা

*গঠন*

২ক.০ উদ্দেশ্য

২ক.১ কালপর্ব ও নামকরণ

২ক.১.১ হরপ্পীয় সভ্যতার সূত্রপাত

২ক.১.২ মেহেরগড় উৎখনন ও প্রাপ্ত নিদর্শসমূহ

২ক.২ হরপ্পীয় সভ্যতার বিস্তার

২ক.২.১ সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক জীবন

২ক.২.২ গ্রাম-শহরের সংযোগ

২ক.৩ বাণিজ্য

২ক.৩.১ বাণিজ্যিক পথ

২ক.৪ সমাজ ও ধর্মীয় জীবন

২ক.৪.১ অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস

২ক.৪.২ ধর্মবিশ্বাস ও ক্ষমতা বিভাজক

২ক.৫ সভ্যতার পতন

২ক.৫.১ বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়

২ক.৫.২ কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন

২ক.৫.৩ বাণিজ্যমুখী অর্থনীতির ভূমিকা

২ক.৫.৪ অভিনবত্ব সৃজনের অভাব

২ক.৫.৫ অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান

২ক.৬ অনুশীলন

২ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে হয়েছিল বলে মনে করা হয়; শুরু থেকেই আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্যে মানুষ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করত; তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন হাতিয়ারগুলি পাওয়া গেছে, এবং শুধুমাত্র এদের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মানব জাতির ইতিহাসের আদিমতম এবং প্রায় অন্ধকারতম যুগের উপর কিছু আলোকপাত করা সম্ভব। আলোচনার সুবিধার

জন্যে পণ্ডিতেরা মানব-ইতিহাসের এই সময়কে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন এবং আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে এই যুগ পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত এবং পরিবর্তন সাপেক্ষ। এই যুগে মানব-ইতিহাসের বহু বৈপ্লবিক এবং যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। বিবর্তনের গতি অনুসরণ করে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল। মানব-ইতিহাসের পর্যায়ে একটি নতুনতম ধারা যুক্ত হল যাকে তাম্র-প্রস্তর যুগ বলে অভিহিত করা যায়। তাম্র-প্রস্তর যুগের মানুষেরা নৃতত্ত্বের পৃষ্ঠা অতিক্রম করে ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে; কিন্তু এদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং উৎকৃষ্টতম নমুনা হল হরপ্পীয় সভ্যতা।

## ২ক.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন

- হরপ্পীয় সভ্যতার উৎস ও বিস্তার
- হরপ্পীয় সভ্যতার বিজ্ঞানসম্মত ও সুচিন্তিত নগর-ব্যবস্থা
- হরপ্পীয় সভ্যতার সমাজ-জীবন, ধর্ম ইত্যাদি

## ২ক.১ কালপর্ব ও নামকরণ

সময় অনুসারে যদি ইতিহাসের ভাগ হয় তাহলে দু'টি প্রধান ভাগ আমাদের সামনে এসে পড়ে—(ক) প্রাগৈতিহাসিক যুগ (খ) ঐতিহাসিক যুগ। পূর্বকালে হরপ্পীয় সভ্যতাকে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতার অন্তর্গত বলে মনে করা হত; কিন্তু আধুনিককালে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। তা সত্ত্বেও আমরা যখন ভারতীয় ইতিহাসকে কালানুসারে (ক) প্রাচীন যুগ (খ) মধ্য যুগ (গ) আধুনিক যুগ এইভাবে ভাগ করি, তখনও কিন্তু হরপ্পা সভ্যতাকে আমরা প্রাচীন যুগের অন্তর্গত করতে পারি না; কারণ হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন যুগেও প্রাচীনতম পর্যায়ে অবস্থিত; অর্থাৎ, হরপ্পা সভ্যতা ভারতীয় ইতিহাসের আদিমতম এবং প্রথমতম উল্লেখযোগ্য ধারা।

এই সভ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, হরপ্পীয় সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের সমস্ত জ্ঞান প্রত্নতত্ত্বভিত্তিক এবং এই জ্ঞানের পরিধি অন্যান্য জ্ঞানের বিষয়ের মতোই ক্রমবর্ধমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পূর্বে আলোচনাকে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা এই দু'টি শহরের মধ্যেই সীমিত রাখা হত। কিন্তু বর্তমানে প্রাক্-হরপ্পা, হরপ্পা এবং হরপ্পা-উত্তর সভ্যতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, হরপ্পা সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতাকে প্রাচীন বিশ্বের সমকালীন নদীমাতৃক সভ্যতার সঙ্গে এক পংক্তিতে দাঁড় করিয়েছে এবং হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় এবং মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগ এখন প্রত্নতাত্ত্বিকদের গভীর গবেষণার বিষয়। তৃতীয়ত, হরপ্পীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার কালানুক্রমিক ধারাকে প্রসারিত করেছে। পূর্বে আর্য সভ্যতা থেকে ভারতীয় সভ্যতার শুরু ধরা হত; কিন্তু হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের পর বোঝা গেল যে খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্রাধিক বছর বা তারও পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে এক জনগোষ্ঠী ছিল যারা কৃষি, হস্তশিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে একটি সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

এছাড়াও, হরপ্পা সভ্যতার নামকরণ সম্বন্ধে দু'টি একটি কথা বলা প্রয়োজন। পূর্বে এই সভ্যতাকে "সিন্ধু সভ্যতা" বলা হত; কারণ এই সভ্যতার দু'টি প্রধান কেন্দ্র হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত বলেই প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা একে "সিন্ধু সভ্যতা" বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই নামকরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ ইরাবতী (রাভি) নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত প্রাচীন হরপ্পা শহরটি প্রাচীনত্ব, কৃষি ও সংস্কৃতির বিচারে সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত অন্যান্য শহর অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভূগর্ভস্থিত খননকার্যের ফলে হরপ্পা অঞ্চলে যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে, যেমন তামার তৈরি অস্ত্র, তৈজসপত্রাদি, পোড়ামাটির জিনিস ইত্যাদি, সেগুলি দেখে মনে হয় নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসীরা হরপ্পাবাসীদের অনুকরণ করত; এই অনুকরণকে সহজেই সংস্কৃতির চিহ্ন বলে মনে করা যায়। দ্বিতীয়ত, উৎখননের দ্বারা প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু থেকে প্রমাণ করা যায় যে, হরপ্পা সভ্যতা মহেঞ্জোদারো সভ্যতার থেকে অনেক প্রাচীন। আধুনিক খননকার্যের ফলে অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, রফিক মুঘল প্রমাণ করেছেন যে হরপ্পার সর্ব নিম্নতলে একটি প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার অবস্থিতি রয়েছে। প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতার উপস্থিতি নিরবচ্ছিন্নতার কথা প্রমাণ করে যা অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, প্রত্নতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে কোন প্রত্নবস্তু প্রথম কোন স্থানে পাওয়া গেলে সেই এলাকার সভ্যতার নাম প্রথম স্থানটির নামানুসারে করা হয়ে থাকে। প্রথম আলেকজান্ডার কানিংহাম হরপ্পা থেকে কতকগুলি সিলমোহর পান; ১৮৮৩-৭৩ সালের মধ্যে তিনি কয়েকবার ঐ স্থানটি পরিভ্রমণ করেন এবং বেশ কয়েকটি প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেন; এরও পূর্বে ১৮২৬ সালে চার্লস ম্যাসন হরপ্পা টিবির কথা প্রথম পণ্ডিতমহলের গোচরে আনেন। কানিংহাম, প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা এবং অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ঐসকল প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব বোধহয় যথাযথ অনুধাবন করতে পারেননি; পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত সিলমোহরের সঙ্গে কানিংহাম প্রাপ্ত পূর্বের সিলমোহরের মিল দেখা গেলে হরপ্পায় অনুরূপ সভ্যতার অবস্থান থাকতে পারে এই অনুমানে হরপ্পায় খননকার্য চালানো হয়। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সিন্ধু সভ্যতার নাম পরিবর্তন করে বর্তমানকালে এই নতুন নামকরণ করা হয়েছে।

### ২ক.১.১ হরপ্পীয় সভ্যতার সূত্রপাত

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এক সুউন্নত, পরিশীলিত, পরিণত প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়। এই সভ্যতার পরিণত রূপ প্রথম থেকেই প্রত্নতত্ত্ববিদ্দের ভাবিয়ে তুলেছে শুরুতে এই সভ্যতা কী রকম ছিল? কোথা থেকে এর সূত্রপাত হল তা নিয়ে তারা চিন্তা করতে শুরু করলেন। তখন কোন প্রমাণ সামনে না থাকা সত্ত্বেও মার্শাল সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে সিন্ধুসভ্যতার এক বিরাট পূর্ব বৃত্তান্ত আছে। মার্শালের অনুমান সঠিক প্রমাণ করে ননীগোপাল মজুমদার সিন্ধুপ্রদেশে প্রাক্-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল অনুসন্ধান করবার সময় এমন কতকগুলি প্রত্নবস্তু উদ্ধার করেন যে, তার ভিত্তিতে অনুমান করা সম্ভব হল যে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর চেয়েও পুরাতন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল। আম্রিতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর অনুরূপ বস্তু গাজী শাহতে পাওয়া গেলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমানের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হল। পরে স্যার মার্টিমুর হুইলার হরপ্পার বিশেষ একটি স্থানে, যাকে AB ঢিপি বলা হয়, তার তলায় কতকগুলি মৃৎপাত্র পেলেন যার ভিত্তিতে প্রাক্-হরপ্পা যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেল।

স্বাধীনতাউত্তরকালে ভারত ও পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের চেষ্টায় অনুসন্ধানের ব্যাপারে বেশ কিছু অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল। ১৯৫৫-৫৭ সালে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এফ. এ. খান সিন্ধু প্রদেশের খয়েরপুর জেলার কোটাডিজিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান। এই প্রথম প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতা যুগের প্রাকারবিশিষ্ট একটি জনবসতির আবিষ্কার করা সম্ভব হয়; দেখা গেল যে কিছু মৃৎপাত্রের আকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য পরবর্তী সিন্ধুসভ্যতার যুগেও অনুসৃত হয়েছিল; অর্থাৎ প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতা যুগের সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতা যুগের একটি ধারাবাহিকতা ছিল। ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ জে. এল. ক্যাসালের নেতৃত্বে সিন্ধুপ্রদেশের আম্রিতে এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বি. বি. লাল এবং বি. কে. থাপার ১৯৬০-এর দশকে অধুনা শুষ্ক ঘাঘর নদীর খাতে কালিবঙ্গানে অনুসন্ধান চালিয়ে একই রকম ফল লাভ করলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হল।

কিলি-গুল-মহম্মাদ অঞ্চলে যোয়ার সার্ভিস প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে প্রাক্-সিন্ধু সভ্যতার বেশ কয়েকটি স্তর আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কয়েকটি সাংস্কৃতিক বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর কার্বন[১৪] পদ্ধতি অনুসারে সময়ানুক্রাস নির্ণয় করা সম্ভভব হয়েছে। প্রথম স্তরটির সূচনাকাল আনুমানিক ৩৬৮৮ খ্রিঃপূঃ। পশুচারণের জীবনের ছাপ এই পর্যায়ে স্পষ্ট। ভেড়া, বলদ, ছাগল, গৃহপালিত পশু পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে এবং প্রায় শেষ পর্যায়ে তারা কাদামাটির তৈরি ইট দিয়ে ঘর বানাতে পারত। পাথর এবং হাড়ের তৈরি জিনিস পাওয়া গেছে কিন্তু কোন ধাতব বা মাটির জিনিস নয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে একটু উন্নত পর্যায়ের গৃহনির্মাণ কৌশল দেখা গেল; অপরিপক্ক স্থূল ধরনের মাটির বাসন এবং পূর্বের মতো প্রায় একই ধরনের বস্তুগত জীবনের ছাপ দেখা যায়; চতুর্থ পর্যায়ে এসে প্রথম তামার জিনিস দেখা গেল এবং মৃৎপাত্র নির্মাণের কৌশলেরও অনেক উন্নতি ঘটেছিল; কুমোরের চাকার তৈরি মৃৎপাত্র এবং হাতে তৈরি মৃৎপাত্র উভয় ধরনের পাত্রতে লাল এবং কালো রঙে রং করা এবং নানা ধরনের জ্যামিতিক নকশা দেখা দিল যা পরবর্তীকালের সিন্ধুসভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়।

কিলি-গুল-মহম্মদ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়েরসঙ্গে সমগোত্রীয় আরও অনেক প্রত্নক্ষেত্র উত্তর এবং মধ্য বেলুচিস্তানে পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তর বেলুচিস্তানের লোরালাই উপত্যকার রানা ঘুণ্ডাই প্রত্নক্ষেত্রের নাম করা যায়। উত্তর এবং মধ্য বেলুচিস্তানে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষে পরিবর্তনের হাওয়া আসতে শুরু করে। অলচিন দম্পতি "মুন্ডিগক" প্রত্নক্ষেত্রটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে চতুর্থ পর্যায়ে গ্রাম থেকে শহরে পরিণত হবার চিহ্ন দেখা যায়—চতুর্দিকে প্রাকার বেষ্টিত শহর, বৃহৎ একটি বাড়ি যাকে প্রায় প্রাসাদ বলা যায়, প্রচুর লাল/কালো রঙের মৃৎপাত্রের সমন্বয়—সম্পূর্ণভাবে এই পর্যায়টি হরপ্পীয় যুগের সঙ্গে তুলনীয়। অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ডাজ এফ্ ডেলস (১৯৬৫) এবং যোয়ায় গর্ভিসা (১৯৬৭) পৃথক পৃথকভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে। কোট ডিজি, মুন্ডিগক প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে উত্তরণ ঘটে; প্রাকারযুক্ত দুর্গ, ঘন জনবসতি ইত্যাদি শহরের ইঙ্গিত বহন করে এবং চূড়ান্ত পর্যায় যাকে ডলস্‌ফেজ্ এফ বলে উল্লেখ করেছেন তা সিন্ধু সভ্যতার সমগোত্রীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়।

সুতরাং প্রায় প্রত্যেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্, বিশেষ করে অলচিন দম্পতি, অমলানন্দ ঘোষ পরিষ্কারভাবে "প্রাক্-হরপ্পা যুগে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা" লক্ষ্য করলেন। হরপ্পীয় সভ্যতার মূল উপাদানগুলি প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতি

থেকে গৃহীত হয়েছে এবং সেইজন্যেই প্রাক্-হরপ্পীয় যুগকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে অধ্যাপক এস. সি. মালিক তার বই *ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন*-এ প্রাক্ হরপ্পীয় যুগকে হরপ্পীয় যুগের 'পূর্ব প্রস্তুতি' বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রাক-হরপ্পার গ্রামীণ জনবসতির স্তর থেকে হরপ্পার নাগরিক স্তরে উত্তরণ কীভাবে সম্ভব হল? এই উত্তরটির ব্যাখ্যা নানা পণ্ডিতেরা নানাভাবে করার চেষ্টা করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্যে এদের দু'টি দলে ভাগ করা যায়; প্রথম দলের পণ্ডিতেরা হরপ্পার পরিবর্তনের জন্যে বৈদেশিক প্রভাবকে দায়ী করছেন।

## ২ক.১.২ মেহেরগড় উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ

প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতা পর্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নক্ষেত্র মেহেরগড়। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত *ভারতীয় সভ্যতার জন্ম* বইটিতে অলচিন দম্পতি খুব জোরের সঙ্গে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার সঙ্গে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার একটি যোগসূত্রর কথা ঘোষণা করেছিলেন। পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; তার সূত্রপাত প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে সভ্যতা সম্বন্ধে ক্রমাগত গবেষণা তাদের ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। মেহেরগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মধ্য দিয়ে প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতা কীভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতায় পৌঁছাল তার প্রামাণ্য চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

মেহেরগড় কচ্ছ উপত্যকায় বোলান নদীর উৎসস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক মিশন এই প্রত্নক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন। প্রায় ১৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত প্রত্নক্ষেত্রটি সিন্ধুসভ্যতার সাম্প্রতিকতম গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে অসীম গুরুত্বের অধিকারী। সাতটি পর্যায়ে মেহেরগড়কে বিভক্ত করা সম্ভব। প্রথম তিনটি পর্যায় নব্য প্রস্তর যুগের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনতম পর্যায়ে খুব সম্ভবত বোলান নদীর উঁচু পারে একদল ভ্রাম্যমাণ পশুচারণকারীর বসবাস ছিল। ক্রমশ স্থায়ী জনবসতি ঐ এলাকায় গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণস্বরূপ কাদামাটির ইঁটের তৈরি ঘরবাড়ি এবং ব্যবহৃত জিনিসের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। খ্রিঃপূঃ ছয় সহস্রাব্দে আবিষ্কৃত (অর্থাৎ ৫১০০ খ্রিঃপূঃ) কাদা-মাটির ইঁটের তৈরি বেশ কিছু বাড়ি পাওয়া গেছে; এইসব কাদামাটির ইঁটগুলি বিশেষ কায়দার তৈরি; অর্থাৎ ইঁটগুলির কোণগুলি গোলাকার এবং নির্মাতাদের আঙুলের ছাপ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় বসবাসের বাড়ি ছাড়াও ছয় কক্ষ এবং নয় কক্ষ বিশিষ্ট শস্যাগার পাওয়া গেছে।

মেহেরগড়ে এই পর্যায়ে আবিষ্কারের মধ্যে খ্রিঃপূঃ চতুর্থ সহস্রাব্দের একটি সমাধিস্থল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাতিষ্ঠানিক সমাধিক্ষেত্রগুলির মধ্যে এটি অন্যতম সমাধিক্ষেত্র। সমাধিক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানারকম পুঁতি পাওয়া গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধহয় একটি তামার পুঁতি। এই পুঁতিটি তামার নির্মিত জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম এবং বোধহয় প্রথমতম। প্রলেপ দেওয়া ঝুড়ি পাওয়া গেছে; এগুলিকে বোধহয় মাটির পাত্রের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হত; অর্থাৎ কুমোরের চাকা থেকে তৈরি মৃৎপাত্র তখনও অজানা ছিল। শান দেওয়া পাথরের জিনিস অনেক দেখা গেছে। বেশ কয়েকটি পাথরের কুঠার পাওয়া গেছে যার মধ্যে বিশেষ কারিগরী কৌশল রয়েছে। এর থেকে মনে করা যেতে পারে যে নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই এই বিশেষ ধরনের পাথরের কুঠার নির্মাণের কায়দা এই এলাকার লোকেরা আয়ত্ত করেছিল।

সবচেয়ে চমকপ্রদ আবিষ্কার বোধহয় টার্কয়েজের তৈরি একটি পুঁতি। এটিও সমাধিক্ষেত্র থেকে পাওয়া গেছে। এটি স্থানীয় জিনিস নয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সুপ্রাচীনকাল থেকেই মূল্যবান এবং অপেক্ষাকৃত

কম মূল্যবান পাথর দূর দেশ থেকে আমদানি করা হত; অনুমান করা যেতে পারে যে, মেহেরগড়ের লোকেরা তুর্কমেনিয়া থেকে এগুলি আমদানি করতেন। তাহলে বাণিজ্যের জন্যে হরপ্পা সভ্যতার যে বিশিষ্টতা তা বহু পূর্বেই মেহেরগড়ে লক্ষ্য করা যায়। খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠ সহস্রাব্দতেই তারা বিলাস এবং প্রসাধন দ্রব্যের এবং হয়তো আরও অনেক জিনিসের দূরপাল্লার বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিলেন একতা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। পরবর্তীকালে রহমান ঢেরী এবং লি-ওয়ানের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু বাণিজ্যের তত্ত্বকে আরও জোরদার করে।

মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্যায় সরাসরি প্রথম পর্যায় থেকে উদ্ভূত; এই পর্যায়ের শেষের দিকে মৃৎপাত্রের আবির্ভাব ঘটে এবং কোন কোন সময়ে সেগুলিকে চিত্রিত করবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। মৃৎপাত্রগুলির সঙ্গে কিলি-গুল-মুহম্মদ (প্রথম পর্যায়) এবং মুণ্ডিগক (প্রথম পর্যায়) প্রত্নক্ষেত্রে মৃৎপাত্রগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পাথরের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদন ও নির্মাণ পূর্বের মতোই অব্যাহত ছিল। দূরপাল্লার বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা প্রমাণিত হয় বিভিন্ন ধরনের শঙ্খ এবং টার্কয়েজ পাথরের অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাপ্ত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে ছিদ্রযুক্ত দস্তার তৈরি একটি টুকরোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; বোধহয় এটিও ব্যবসার সূত্র ধরে এখানে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা যাই হোক না কেন, দস্তার টুকরোটি হরপ্পা সভ্যতার আগে একমাত্র দস্তা ধাতুর নিদর্শন। বাদখ্শান থেকে ল্যাপিস-লাজুলীও ব্যবসাসূত্র আনা হত বলে মনে করা হয়।

মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্যায়ে মৃৎশিল্প মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। নিয়মিত প্রথামাফিক কৃষিকার্য জনজীবনের একটি অঙ্গে পরিণত হয়েছে। প্রাক্-ষষ্ঠ সহস্রাব্দ পূর্বেই লোকেরা বার্লি, গম এবং খেজুর নিয়মিতভাবে উৎপাদন করতেন। বহু বন্য পশুকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছিল এবং তাদের কৃষিকাজেও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃষিজ বস্তু হল দানা জাতীয় শস্যের উৎপাদন। দানা জাতীয় শস্যের উৎপাদন খাদ্য অভ্যাসকে পরিবর্তিত করেছে সন্দেহ নেই। এরই ফলে বোধহয় প্রস্তর-ব্যবহারকারী মৃৎশিল্পের সঙ্গে অপরিচিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানারকম আকর্ষণীয় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। আরও উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বোধ হয় তুলো চাষের কৃৎকৌশল আয়ত্ত করা। হরপ্পীয় সভ্যতার আবিষ্কারের প্রায় দু'হাজার বছর আগে তুলোর চাষ এবং সুতিবস্ত্র নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। হরপ্পীয় সভ্যতার কৃষির ঐতিহ্য প্রায় হরপ্পার চেয়ে দুই সহস্র বছরের প্রাচীন মেহেরগড় থেকে এসেছে বলা যেতে পারে। মেহেরগড় চতুর্থ থেকে সপ্তম পর্যায় স্পষ্টভাবে বিবর্তনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। জনবসতি আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নয়। মেহেরগড়ের দক্ষিণে ঘনজনবসতির প্রমাণ মেলে। আমরী, ডাম্ব-সাদাত ইত্যাদি স্থানের প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের সঙ্গে মেহেরগড়ে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা একটি কালানুক্রমিক সময়পঞ্জী নির্মাণ করা যায়। বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হচ্ছে পোড়ামাটির তৈরি একটি স্ত্রী-মূর্তি। এটির সঙ্গে মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির স্ত্রী-মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কুমোরের চাকা থেকে নির্মিত মৃৎপাত্র সর্বত্র প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এই প্রথম পাথরের এবং হাড়ের তৈরি সিলমোহর পাওয়া গেল যা পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির তৈরি চার খোপ বিশিষ্ট সিলমোহরটি বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। একটি বিরাট কাদা-মাটির ইঁটে তৈরি চাতাল পাওয়া গেছে। মাটির তৈরি জিনিসের মধ্যে অশ্বত্থ পাতা এবং মাছের নমুনা বেশি করে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাথর দিয়ে পাতার

মতো দেখতে তীরের ফলা বেশ কয়েকটি পাওয়া গেছে। দামী এবং কমদামী পাথর, বিশেষ করে ল্যাপিস-লাজুলী দূরপাল্লার বাণিজ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে সপ্তম এবং চূড়ান্ত পর্যায় সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। রোদে পোড়া ইঁটের তৈরি বাড়ি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হত। একটি বিশেষ বাড়ির কথা বলা হচ্ছে যেটি মনে হয় শুধু শিল্পকাজের জন্যেই ব্যবহৃত হত। মৃৎশিল্পের ধারা অব্যাহত থাকছে এবং সেখানে নানারকম উন্নতি বিধান করা হচ্ছে। শত শত মাটির পুতুল পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে কয়েকটির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টতাপূর্ণ। পোড়া মাটির সিলমোহর আরও বেশি করে তৈরি করা হচ্ছে। শান দেওয়া পাথরের তৈরি জিনিস শেষ অবধি উৎপাদন করা হচ্ছে।

সুতরাং মেহেরগড়কে প্রাক্-নাগরিক প্রাথমিক পর্যায়ের সিন্ধুসভ্যতার পূর্বসূরি বলে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। নব্য প্রস্তর যুগের স্তর থেকে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার প্রায় সবকটি স্তরই মেহেরগড় সভ্যতায় ধরা পড়ে। ধারাবাহিক প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন খুঁজতে গেলে আমাদের মেহেরগড়কে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করতে হবে।

অভারতীয় উভয়বিধ পণ্ডিতদেরই যুক্ত করতে পারি। ১৯৫৬ সালে আর. হাইনে জেলর্ডান (১৯৫৬) সিন্ধুসভ্যতার শহরগুলিকে ঔপনিবেশিক কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করলেন। ১৯৫৮ সালে ডি. এইচ. গর্ডন অনুমান করলেন যে এলাম এবং মেসোপটেমিয়া থেকে জনবসতির অভিপ্রায় সিন্ধু অঞ্চলে এসেছিল এবং তারাই হরপ্পীয় সভ্যতার পরিবর্তন সম্ভব করেছে। মার্টিমুর হুইলার বৈদেশিক প্রভুত্বের কথা গভীরভাবে ভেবেছেন। ১৯৭২ সালে সি. সি. ল্যানবার্গ কার্লভস্কি বৈদেশিক বাণিজ্যকে সিন্ধু সভ্যতার নগরায়ণের জন্য দায়ী করলেন। শিরীন রত্নাগর (১৯৮১) বাণিজ্যকে নব ঔপনিবেশকতার একটি পর্যায় বলে মনে করলেন। হরপ্পা অঞ্চলের লোকেরা পশ্চিমের দেশগুলিতে পণ্য-সরবরাহ করত এবং তাদের চাহিদা পূরণ করত। ফ্লাম (১৯৮৪) মেসোপটেমিয়া এবং এলামের সঙ্গে আম্রি-নাল-কোটদিহি এই অঞ্চলের সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন এবং তিনি 'এলামের বহির্ভাগ' বলে একটি অঞ্চলের কথা কল্পনা করেছিলেন যার মধ্যে দক্ষিণ বেলুচিস্তান, সিন্ধু প্রদেশ-কোহিস্তানকে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

অন্যদিকে, স্টুয়ার্ট, পিগট বহির্ভারতের প্রভাবে সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে এই সম্ভাবনাকে মানতে রাজী নন। ফেয়ার সার্ভিসের কোন স্থির মত নেই; একদিকে তিনি বলছেন এই সভ্যতার বিশিষ্ট রূপগুলি দেশীয় উৎস থেকে উঠে এসেছিল কিন্তু বিস্তারিত দিকগুলি বৈদেশিক প্রভাবে ঘটেছে। অলচিন দম্পতি এবং অমলানন্দ ঘোষ প্রাক্-হরপ্পা সভ্যতা থেকে স্বাভাবিকভাবে নিয়ম অনুসারে হরপ্পীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করেন, যদিও অলচিন দম্পতি *দি বার্থ অফ্ ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন*-এ প্রাক্-হরপ্পা পর্যায়ের মুন্ডিগক প্রত্নক্ষেত্রটি আলোচনা করবার সময় ইরানের কাছাকাছি অবস্থানের জন্য পরিবর্তনগুলি সম্ভব হয়েছিল কি না এই নিয়ে মৃদু প্রশ্ন তুলেছেন। রফিক মুঘলের কাজ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ফেয়ার সার্ভিসেস-এর সঙ্গে একমত হয়ে মন্তব্য করেছেন যে সিন্ধুসভ্যতার বিকাশের জন্যে কোন বহিরাগত প্রভাব দায়ী ছিল না। ডি. পি. আগরওয়াল (১৯৮২) হরপ্পা সংস্কৃতিকে সুমের থেকে উৎপাটিত করে আনা হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন। তবে যেহেতু সুমেরীয় সভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার থেকে বহু বছরের পুরাতন, তাই বাণিজ্যিক বিনিময় বা অন্যান্য কোন মাধ্যমের

দ্বারা যোগাযোগের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মুঘল অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এইসব তত্ত্বকে বাতিল করে প্রাক্-হরপ্পা যুগকেই হরপ্পীয় সভ্যতার ভিত্তি বলে মনে করেছেন এবং তার মতের স্বপক্ষে সুচিন্তিত যুক্তি উপস্থিত করেছেন। অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী তাঁর *দি আর্কিওলজি অফ্ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান সিটিস*-এ সমস্ত অধ্যাপকদের যুক্তিতর্ক উপস্থিত করবার পর তার নিজস্ব মতামত উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে খুব সাধারণ মানে (ক) জলসেচ ব্যবস্থা, (খ) হস্তশিল্পের ক্রমাগত বিশেষীকরণ, (গ) তামাকে গলিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করবার দক্ষতা, ইত্যাদি উপাদানগুলি প্রাক্-হরপ্পা থেকে হরপ্পীয় সভ্যতায় উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু লিখিত বিবরণের অনুপস্থিতির জন্যে এই তথ্যগুলিকে চূড়ান্ত সত্য বলে মেনে নিতে এখনও অনেক দ্বিধার মধ্যে পড়তে হয়।

## ২ক.২. হরপ্পীয় সভ্যতার বিস্তার

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুসভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল এবং প্রথম দুটি শহর হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর ভৌগোলিক অবস্থান প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিস্মিত করে। কারণ শহর দুটি চারশো মাইল দূরে অবস্থিত হলেও একই সংস্কৃতির অন্তর্গত। সুতরাং সহজেই মনে করা যেতে পারে যে এই সভ্যতা কোনমতেই স্থানীয় বা আঞ্চলিক নয়, এমনকী ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। পরবর্তীকালের ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা সিন্ধুসভ্যতার ভৌগোলিক বিস্তার ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে পুরাতন মতামতগুলি পরিত্যক্ত হচ্ছে এবং নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

এখন পর্যন্ত প্রায় দুশো পঞ্চাশটি নতুন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হরপ্পীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আধুনিক ভারতীয় উপমহাদেশের অবিভক্ত পাঞ্জাবপ্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, গুজরাট, রাজস্থান এবং আধুনিক উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সামান্য অংশ, উত্তরের জম্মুপ্রদেশ থেকে দক্ষিণের নর্মদা নদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃতও; পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মাকারন উপকূল থেকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মরুট পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিভূজাকৃতি এই এলাকা প্রায় ৯৯,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রসারিত এবং আধুনিক পাকিস্তানের চেয়ে আয়তনে বড়। নিশ্চিতভাবেই এটি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের থেকে অনেক বৃহৎ আকারের সভ্যতা ছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় সহস্রাব্দে এত বড় সভ্যতার অস্তিত্ব আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সিন্ধুপ্রদেশে প্রয়াত ননীগোপাল মজুমদারের অনুসন্ধানের ফলে নতুন হরপ্পার সংস্কৃতি-বিশিষ্ট কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। ফলে দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) থেকে উত্তরে জ্যাকোবাবাদ অবধি সিন্ধু নদীকে অনুসরণ করে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়। এদের অধিকাংশই সিন্ধু বা তার উপনদীগুলির ধারে অবস্থিত এবং সামান্য কয়েকটি শহর বাদ দিয়ে অধিকাংশ ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির কেন্দ্র। মহেঞ্জোদারোর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত চানহু-দারো ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং প্রায় একই দূরত্বে আম্রি প্রত্নক্ষেত্রটি অবস্থিত। প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতির আলোচনায় আম্রি এক উজ্জ্বল নাম।

এ ছাড়াও, আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বে অক্ষু নদীর উপত্যকায় শর্তুগাই পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার একটি কেন্দ্র এবং শর্তুগাইকে ধরা হলে হরপ্পীয় সভ্যতার সীমা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমা

অতিক্রম করে আরও বহুদূর বিস্তৃত হয়। স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন হরপ্পীয় অঞ্চলটিকে অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী মূল সভ্যতার মধ্যে না ধরে একটি "বাণিজ্যিক উপনিবেশ" বলে গণ্য করতে ইচ্ছুক।

স্বাধীনতার উত্তরকালে নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে পশ্চিম উপকূলে হরপ্পীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে প্রায় ৮০০ মাইল সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে সিন্ধু এলাকার মধ্যে যুক্ত হয়েছে; সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াওয়ার) থেকে কাম্বে উপসাগর অবধি প্রায় ৪০টি কেন্দ্র আবিষ্কার করা গেছে। কিম প্রণালীর উপর গেট্রভ মহেঞ্জোদারো থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সিন্ধুসভ্যতার দক্ষিণতম প্রসারণ। এই অঞ্চলকে মার্টিমুর হুইলার সৌরাষ্ট্র প্রদেশ বলে অভিহিত করেছেন। এই অঞ্চল মূল সভ্যতার কেন্দ্র থেকে এতদূরে অবস্থিত হয়েও সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

গুজরাট ব্যতীত, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলে হরপ্পীয় সভ্যতার চিহ্নযুক্ত অঞ্চল পাওয়া যায়। পূর্বে কোশাম্বী প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমিতে সিন্ধুসভ্যতা কেন প্রবেশ করেনি তার নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মেরুট জেলায় আলমগীরপুরে সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হলে গাঙ্গেয় ভূমিতে অনুপস্থিতির ব্যাখ্যাগুলি ভুল বলে প্রমাণিত হল। আলমগীরপুরের পূর্বে আর কোনও হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্র নেই। ফলে হরপ্পা সভ্যতা গাঙ্গেয় উপত্যকার সামান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্গত ভৌগোলিক অঞ্চলে শহরের লোকসংখ্যা মুষ্টিমেয়। অধ্যাপিকা নয়নজ্যোতি লাহিড়ীর মতে, প্রত্যেকটি শহরের অবস্থানগত গুরুত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জাবে অবস্থিত হরপ্পা, সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো। হুইলারের মতে, এই দুটি শহর বোধহয় যৌথভাবে রাজধানীর কাজ করত। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে পরবর্তী ইতিহাস থেকে নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর চানহু-দারো বোধহয় প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। চতুর্থ শহর লোথাল কাম্বে উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি নৌবন্দর। উত্তর রাজস্থানে অবস্থিত কালিবঙ্গান পঞ্চম শহর। হরিয়ানা প্রদেশের হিসার জেলায় অবস্থিত বানওয়ালী চার্চ গুরুত্বপূর্ণ শহর। হরপ্পা সভ্যতার পরিণত এবং সমৃদ্ধতম রূপ এই ছয়টি শহরে দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও, উপকূলবর্তী শহর ঘুটকাজেনডব এবং ঘুরকেটাডাতে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতা লক্ষ্য করা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তারের আলোচনার পর পরবর্তী যে সমস্যা আমাদের ভাবিত করে তা হল এর সময়। দুটি দিক থেকে সমস্যাটিকে দেখা দরকার। প্রথম দিকটি হল সময়ের ব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্বনিম্ন সময় এবং সর্বোচ্চ সময়; বলা বাহুল্য এই দুটি সময়কাল আনুমানিক, যথার্থ ঐতিহাসিক সময় নয়। দ্বিতীয় দিকটি হল পদ্ধতিগত দিক, অর্থাৎ কোন্ পদ্ধতি অনুসারে সময় নির্ণয় করা যাবে। এখানেও বিভিন্ন ভাবনার অবকাশ আছে।

হরপ্পীয় সভ্যতার কোন কেন্দ্রেই লোহা পাওয়া যায়নি, সুনিশ্চিতভাবে এটি লৌহপূর্ব যুগের সভ্যতা, মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় সর্বত্র খ্রিস্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দের মাঝামাঝি লোহার প্রচলন হয়; তাহলে ঐ সময়ের কিছু আগে বা পরে সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই সময়টি আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিঃপূঃ বলে ধরা যেতে পারে। উচ্চতর সময়সীমাটিও এইরকম আনুমানিক। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে মহেঞ্জোদারোর সাতটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। সাতটি স্তরের বিকাশের জন্য এক হাজার বৎসর নির্দিষ্ট করলে

উপরের সীমা ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গিয়ে দাঁড়ায়, যদিও এই সময়সীমাকে আরও পেছিয়ে নিয়ে গিয়ে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে অনেকে নিয়ে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত দুটি দিক থেকে পদ্ধতিগত বিষয়টি আলোচনা করা যায়। প্রথমটি হল আধুনিক রেডিও কার্বন পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হল তুলনামূলক পদ্ধতি। বিভিন্ন কারণে প্রত্নতাত্ত্বিকরা তুলনামূলক পদ্ধতিকে বেশি পছন্দ করেন। হরপ্পা সভ্যতার পরিণত পর্যায়ে মেসোপটেমিয়া, সুমের ও এলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ২৬০০ খ্রিঃপূঃ সিন্ধু এলাকায় তৈরি কার্নেলিয়ানের পুঁতি মেসোপটেমিয়াতে পাওয়া গেল। সুতরাং ২৬০০ খ্রিঃপূঃ বা তার কিছু আগে থেকেই সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব পাওয়া গেল। সুতরাং সেই দিক থেকে ২৭০০/২৮০০ খ্রিঃপূঃ বা তারও সামান্য আগে সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে হরপ্পীয় সভ্যতার তারিখ নির্ণয় করেছেন। মার্শাল ৩২৫০-২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সিন্ধুসভ্যতার সময়কে সীমাবদ্ধ করেছেন; অন্যদিকে ম্যাকের মতে এই সময়সীমা খ্রিঃপূঃ ২৮০০-২৫০০। উভয়ের মতামতকেই আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা সমালোচনা করেছেন। হুইলারের মতে হরপ্পীয় সভ্যতা ২৫০০-১৫০০ খ্রিঃপূঃ অবধি স্থায়ী ছিল এবং আধুনিক রেডিও-কার্বন পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা করে ডি. পি. আগরওয়াল প্রায় একই মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, হরপ্পা সভ্যতার স্থায়িত্বকাল ২৩০০-১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। সুতরাং এইসব বিভিন্ন আলোচনার পরিপ্রক্ষিতে একথা সহজেই বলা চলে যে হরপ্পীয় সভ্যতার ভৌগোলিক সীমানা এবং সময়ের পরিধি উভয়ই অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

## ২ক.২.১ সিন্ধু সভ্যতায় নাগরিক জীবন

আয়তন, বৈচিত্র্য এবং প্রত্নবস্তুর বিশিষ্টতার দিক দিয়ে বিচার করলে সমস্ত হরপ্পীয় প্রত্নক্ষেত্রগুলির মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। সিন্ধু নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো এবং আধুনিক রাভি নদীর বাম তীরে হরপ্পা অবস্থিত। যদিও কোন লিখিত প্রমাণ নেই তবুও প্রত্নতাত্ত্বিকরা হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোকে বিশাল হরপ্পীয় সাম্রাজ্যের যুগ্ম রাজধানী বলে বর্ণনা করেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকরা বহুবার এই শহর দুটিতে উৎখননের কাজ চালিয়েছেন কিন্তু নানারকম ভূ-তাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক অসুবিধার জন্যে সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও বিশাল হরপ্পীয় এলাকায় এক ধরনের সহমত এবং সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রায় একই ধরনের স্থাপত্য এবং নগর পরিকল্পনা, একইরকম ওজন ও মাপ, লিখন পদ্ধতি, সমস্ত হরপ্পা জুড়ে স্বাধীন বাণিজ্য, সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে কেন্দ্রিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই কেন্দ্রিকতা কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং পুরুষানুক্রমে তা কীভাবে স্থায়ী হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এক অপার বিস্ময়। হরপ্পীয় সভ্যতার নাগরিক জীবনে কেন্দ্রিকতা ও রক্ষণশীলতার ছাপ স্পষ্ট। সমস্ত হরপ্পীয় সভ্যতার নগর-পরিকল্পনা, একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ছোট ও বড় প্রত্যেকটি নগর উঁচু ও নিচু দুটি এলাকার দ্বারা বিভক্ত ছিল। উঁচু এলাকাকে প্রায় সবাই মার্শালকে অনুসরণ করে সিটাডেল বা দুর্গ এলাকা বলছেন। আয়তক্ষেত্রাকার, প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত এই দুর্গগুলি প্রায়শই নগরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্যে সুউচ্চ তোরণ এবং পরিখার ব্যবহার দেখা যায়।

হরপ্পীয় সভ্যতার নগর পরিকল্পনায় খানিকটা নিয়মমাফিক ছক আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এই নগর পরিকল্পনার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। যেমন কালিবঙ্গানের উঁচু এলাকা দুটি ভাগে বিভক্ত। এই ব্যবস্থা

অন্য কোথাও নেই অন্যদিকে অধুনা আবিষ্কৃত ধোলাবিরাতে নগর তিনভাগে বিভক্ত (১) উঁচু শহর (২) মাঝের শহর ও (৩) নীচের শহর। মাঝের শহর নগরীর আর কোথাও নেই। গুজরাটের উপকূলে অবস্থিত লোথাল একটি বন্দর-নগরের ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে; ফলে এই নগরের পরিকল্পনা অন্যান্য হরপ্পীয় নগরের থেকে পৃথক। হরপ্পীয় শহরগুলির স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জ্যাকমেন কিছুটা সংশোধন করেছেন। তিনি স্বীকার করছেন, এই নগর স্থাপত্যের পিছনে প্রতিভা ও মার্জিত রুচির ছাপ পাওয়া যায় কিন্তু পরিকল্পনার মূল ভিত্তি বোধহয় গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। একেই তিনি "Cosmological principles" বলতে চান। সুরক্ষিত এই সিটাডেল এলাকাতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্মগুলি যেমন 'বিরাট স্নানাগার', 'বিশাল শস্যাগার', 'শাসকের প্রাসাদ' দেখতে পাওয়া যায়। নিচু এলাকা অপেক্ষাকৃত ঘনবসতিপূর্ণ এবং সাধারণ অবস্থার লোকেরা বাস করতেন। স্থাপত্যকর্মই হরপ্পীয় সমাজের শ্রেণীবিভাজনের কথা বুঝিয়ে দেয়।

নিকটবর্তী এলাকায় পাথরের ঘাটতির জন্যেই বোধহয় সমস্ত হরপ্পীয় এলাকায় ইঁটের ব্যবহার দেখা যায়। কাদামাটি দিয়ে তৈরি ইঁটের ভঙ্গুরতা, জলে ধুয়ে যাবার প্রবণতা রোধ করবার জন্যেই বোধহয় পরবর্তীকালে আগুনে পোড়া ইঁটের শুরু হয়েছিল। অলচিন দম্পতি যে 'সাংস্কৃতিক ঐক্য' বা স্টুয়ার্ট পিগট যে 'কেন্দ্রিকতা'-র উল্লেখ করেছেন ইঁট ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা বোঝা যায়। জলনিকাশী নালা বা যেকোন স্থায়ী বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে পোড়া ইঁট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মাপ ১১ ইঞ্চি লম্বা, ৫$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি চওড়া ও ২$^{৩}/_{৪}$ ইঞ্চি পুরু।

সাধারণের বসতি এলাকাতে বর্গাকৃতি উঠান ছিল একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উঠানকে কেন্দ্র করে ছোটবড় বিভিন্ন কামরাবিশিষ্ট ঘর, রান্নাঘর, স্নানাগার ইত্যাদি। আন্না সারকিনা মহেঞ্জোদারোর সাধারণের ঘরগুলি পরীক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের উঠানের খোঁজ পেয়েছেন এবং তার বিভিন্ন ব্যবহারও লক্ষ্য করেছেন। যেমন কোনো ক্ষেত্রে উঠানগুলি বাস্তুবাড়ির প্রয়োজনে, কোথাও হাতের কাজ করবার জন্যে, কোথাও বা উভয়বিধ কাজ করবার জন্যে ব্যবহৃত হত।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার কাজে জলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই কি বাস্তুবাড়িগুলিতে জলের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্যে কুয়োর ব্যবস্থা ছিল? কোথাও বাড়ির নিজস্ব কুয়ো অথবা দুটি বাড়ির মাঝে কুয়োগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়; বহু লোক যে কুয়ো ব্যবহার করতেন, সেখানে বসবার জায়গা আলাদা করে তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। জ্যানসেন হরপ্পীয় শহরের কুয়োগুলির ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের প্রশংসা করেছেন। মহেঞ্জোদারোতে প্রতি তিনটি পরিবার পিছু একটি কুয়ো দেখা যায়, যা সমসাময়িক মিশর বা মেসোপটেমিয়াতে বিরল। কিন্তু কালিবঙ্গানে কাছাকাছি নদীর অবস্থান থাকার জন্যে কুয়োর ব্যবহার বিরল।

মহেঞ্জোদারোতে স্নানাগার শৌচাদি কাজের জন্য পৃথক স্থান নির্দিষ্ট ছিল। স্নানাগারগুলি নির্মাণের বিশেষ পদ্ধতি এবং উঁচু তলা থেকে জল বের করবার জন্যে মাটির নল ব্যবহার করা—সবই সুচিন্তিত পরিকল্পনার পরিচায়ক। মহেঞ্জোদারোতে স্নানাগার, কুয়ো ইত্যাদির ব্যবহার ব্যাপক থাকার জন্যে ম্যাকে মার্শাল এর পিছনে ধর্মীয় ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন।

উন্নত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহেঞ্জোদারো এবং লোথালে উন্নত পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক বাড়ির পরিত্যক্ত জল নালার মাধ্যমে বড় রাস্তায় বৃহৎ নর্দমায় এসে পড়ত।

মহেঞ্জোদারোতে বড় রাস্তায় তো বটেই—এমনকী, ছোট ছোট রাস্তাতেও নর্দমা ছিল। ইঁটের তৈরি পাথর দিয়ে ঢাকা এই নর্দমাগুলি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা হত; নর্দমার মাঝে মাঝে চৌবাচ্চা তৈরির প্রক্রিয়া থেকে তা বোঝা যায়। জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জলনিকাশী ব্যবস্থার অস্তিত্ব থেকেই স্টুয়ার্ট পিগট একটি "পৌরকর্তৃপক্ষের" কথা চিন্তা করেছেন যাদের হাতে বেশ কিছু কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা ছিল। এই "পৌরকর্তৃপক্ষ" বোধহয় কালিবঙ্গানে ছিল না, কারণ সেখানে জনসাধারণের ব্যবহৃত জলনিকাশী ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

নাগরিক সভ্যতার অপর একটি বৈশিষ্ট্য আমরা হরপ্পার রাস্তাগুলির মধ্যে খুঁজে পাব। একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করে শহরগুলিতে রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি শহরের উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত ছিল; এই রাস্তাগুলি শহরকে কয়েকটি প্রধান আয়তক্ষেত্রকার ভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। স্টুয়ার্ড পিগট মনে করেছেন যে যদি এই ছক মহেঞ্জোদারোতে সর্বত্র অনুসরণ করা হয়ে থাকে তাহলে দেখা যাবে যে বারোটি বড় বড় বাড়ি তিন সারি রাস্তার চারটি ভাগের মধ্যে পড়েছে এবং পশ্চিমদিকের কেন্দ্র রয়েছে সিটাডেল বা দুর্গ এলাকা। মহেঞ্জোদারোতে এইচ. আর. এলাকার ৩০ ফুট চওড়া রাস্তাগুলি কয়েক সারি চাকাওয়ালা যানবাহনের জন্যে উপযুক্ত ছিল। সমস্ত রাস্তা অত চওড়া ছিল না; লোথাল ও কালিবঙ্গানে মহেঞ্জোদারোর মতো চওড়া রাস্তা দেখা যায় না। কিন্তু প্রতিটি রাস্তা সোজাসুজি তৈরি করবার প্রবণতা দেখা যায়। বড় চওড়া রাস্তার পাশে সরু অপ্রশস্ত গলি এবং সেখানে ছিল বাড়িগুলির সদর দরজা। সোজা রাস্তা এবং দক্ষিণ দিকে বাঁক নেওয়ার প্রবণতা হরপ্পার নগর-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একটা জিনিস ভাবতে অবাক লাগে যে এত চওড়া রাস্তা কিন্তু পথচারীদের চলবার জন্যে ফুটপাথের কথা ভাবা হয়নি; শুধু মহেঞ্জোদারোতে ডি. কে. এলাকাতে এবং কালিবঙ্গানে সামান্য ইঙ্গিত মেলে।

নগর পরিকল্পনা করার সময় পরিকল্পনা রচয়িতারা সৌন্দর্যের চেয়ে প্রয়োজনীয়তার কথা বেশি করে ভেবেছেন। যেমন জনস্বাস্থ্য বা সমবেতভাবে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যে মহেঞ্জোদারোতে একটি স্নানাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। কৃত্রিম এই জলাশয়টি শহরের উঁচু এলাকায় অবস্থিত; আয়তক্ষেত্রাকার এই জলাশয়টি একটি প্রশস্ত আঙ্গিনার মাঝখানে অবস্থিত এবং লম্বা ও চওড়ায় ৩৯ ফুট × ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট। ওঠাবার ও নামবার সিঁড়ি; চারপাশে ছোট ছোট ঘর, উৎকৃষ্ট ইঁটের কাজ, কৃত্রিমভাবে জল ভরবার এবং বের করে দেবার পদ্ধতি সবই এই স্থাপত্যকর্মটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কী উদ্দেশ্যে এই স্নানাগারটি ব্যবহার করা হত তা নিয়ে সবাই একমত নন। এটা ঠিক যে স্নানাগারটি এতবড় যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। মার্শাল মনে করছেন যে, "জল-চিকিৎসার" জন্যে ব্যবহার করা সম্ভব; কোশাম্বী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথা ভেবেছেন; হুইলারও জলাশয়টিকে পুরোহিত তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন।

বৃহৎ জলাশয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি স্নানাগার আবিষ্কার করা গেছে। ক্ষুদ্র পরিসর দ্বারা বিভক্ত এই স্নানাগারগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গোপনীয়তা। ডাঃ ম্যাকে মনে করেন উচ্চশ্রেণীর পুরোহিতেরা এই স্নানাগারটিকে ব্যবহার করতেন এবং বৃহৎ জলাশয়টি ছিল সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট।

অপর একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি হল বৃহৎ শস্যাগার। শস্যাগারটির স্থায়িত্ব রক্ষার জন্যে মজবুতভাবে নির্মিত; ভেতরের বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা; এবং শস্য ওঠানো ও নামানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা পূর্ব চিন্তার ফলাফল।

হরপ্পাতেও অনুরূপ একটি শস্যাগার দেখতে পাওয়া যায়। এখানে শস্যাগার সংলগ্ন এলাকায় ফসল ঝাড়াই-বাছাই, মাড়াই করা হত এবং একই স্থানে দুই সারি ছোট ছোট ঘরের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা বসবাস করতেন। শস্যাগার দুটির ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ছাপ পাওয়া যায়; মহেঞ্জোদারোর শস্যাগারটির আয়তন হরপ্পার সমবেত শস্যাগারগুলির আয়তনের সমান। শহরের জনগণকে শস্য সরবরাহ ছাড়াও মুদ্রা-অর্থনীতির অনুপস্থিতির যুগে এটিকে কোষাগার ব্যবহার করার সম্ভভাবনার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ম্যাকে অপর কয়েকটি বৃহৎ বাড়ির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহেঞ্জোদারোর সাধারণ মাপের বাড়িগুলির মধ্যে একটি ২৫০ ফুট দীর্ঘ প্রাসাদ পাওয়া গেছে; এর কেন্দ্রে দুটি প্রশস্ত আঙিনা এবং চারপাশে ছোট ছোট ঘরগুলি বসতবাড়ি নয়। প্রধান শাসক বা প্রধান পুরোহিত, যদি সেরকম কেউ থেকে থাকেন, তাহলে এই বৃহৎ প্রাসাদ তার বাসগৃহ হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে লিখিত প্রমাণের অপেক্ষা করতে হবে।

মহেঞ্জোদারো শহরের পশ্চিম এলাকায় ম্যাকে একটি স্থাপত্য বস্তুকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছেন। বৃহৎ আকৃতির এই বাড়িটিকে তিনি 'কলেজবাড়ি' নাম দিয়েছেন, এমনকী এর দক্ষিণ দিকে ছাত্রদের প্রবেশগৃহ ছিল বলে তিনি মনে করেন। মার্শালকে অনুসরণে মহেঞ্জোদারোর অপর একটি উল্লেখযোগ্য বাড়িকে 'সভাগৃহ' বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। ফেয়ারসার্ভিস এই বাড়িটিকে মহেঞ্জোদারোর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকীর্তি বলতে ইচ্ছুক। বিরাট এই হলঘরটিতে ২০টি স্তম্ভ রয়েছে। ৫ ফুট × ৩ ফুট মাপের আয়তাকার স্তম্ভগুলি বাড়ির ছাতকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে; চারটি সারিতে পাঁচটি করে স্তম্ভ সাজানো আছে। ম্যাকে এই বিশাল হলঘরটি বণিকদের জন্যে ব্যবহৃত বলে মনে করেন।

সুচিন্তিত নগর পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত জল সরবরাহ, নিকাশী ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য সচেতনতা সমস্ত কিছুই একটি প্রগতিশীল পৌর ব্যবস্থার ইঙ্গিত করে। রাতের বেলায় জনপথে আলোর ব্যবস্থা, গভীর রাতের তদারকি ব্যবস্থা, দূরাগত বণিকশ্রেণীর বিশ্রামাগার, সাধারণের জন্য শস্যাগার, সাধারণ নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেছিল। নগরের বাইরে বিরাট গর্তে নাগরিকদের ব্যবহৃত মাটির ভাঙা জিনিস অন্যান্য পরিত্যক্ত দ্রব্য ফেলে আসতে হত। বিভিন্ন বেষ্টনীতে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী স্তরে পৌর শাসনের শিথিলতা জনকল্যাণমূলক অবস্থার অবনতি ঘটায়। পরিকল্পনা ছাড়াই বাড়ি নির্মাণ হতে শুরু করে; নাগরিকদের ব্যবহৃত রাস্তা আটক করে ফেলা হয়, কুমোররা শহরে এসে জড়ো হয়। মার্টিমুর হুইলার এই অবস্থার সুন্দর বর্ণনা করে বলেছেন যে শহরগুলি তাদের সৌন্দর্য ও সুষমা হারিয়ে ফেলেছে।

### ২ক.২.২ গ্রাম-শহরের সংযোগ

নগর ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হলেও এই সভ্যতায় গ্রাম ও কৃষি ব্যবস্থার ভূমিকা গৌণ সেকথা ভাবলে চলবে না। সেই যুগে গ্রাম শহরে খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা না থাকলে নাগরিক সভ্যতা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। নাগরিক জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষি-অর্থনীতির আলোচনা সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গ্রামের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্য নগরাঞ্চলে খাদ্য অনুৎপাদক সম্প্রদায়ের কাছে যোগান দেওয়া যে-কোন নগরাশ্রয়ী অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক প্রধান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া।" (রণবীর চক্রবর্তী)

রামশরণ শর্মার মতে নীলনদ যেমন মিশরকে সৃষ্টি করেছে এবং মিশরবাসীর খাদ্যের চাহিদা পূরণ করেছে সেইরকম সিন্ধুনদ সিন্ধুপ্রদেশ সৃষ্টি করে সিন্ধু জনগণের অশেষ উপকার সাধন করেছে। ব্যাপক হারে খাদ্য উৎপাদন করবার ক্ষমতা, সিন্ধুর মতো বৃহৎ নদী যার নদী যার সাহায্য পরিবহন, জলসেচ, বাণিজ্য এই ত্রিবিধ কাজ সমাধান করা যায়। এর ফলেই আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে নয়—সিন্ধুনদের সমভূমিতে এই বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

কৃষির ক্ষেত্রে আর একটি কথা স্মর্তব্য এই যে সিন্ধু সভ্যতায় প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব থেকেই কৃষির ঐতিহ্য রয়েছে। দুরকম গমের চাষ হত; লোথালে ধানচাষ করা হত মনে হয়। দেশীয় কার্পাস থেকে তুলা এবং সুতিবস্ত্র উৎপাদন করা হত। হরপ্পা সংস্কৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে কলা, তিল, সর্ষের দানা ও বীজ আবিষ্কৃত হয়েছে। অলচিন দম্পতি কলাই চাষের জমির বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে বাণিজ্যের ফল হিসাবেই হরপ্পীয় সংস্কৃতি এলাকায় কলাই চাষের প্রবর্তন ঘটেছিল। চাষের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সিন্ধুবাসীরা লাঙলের দ্বারা চাষ করতে জানত কিনা এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক ছিল। কালিবঙ্গানের উৎখনন থেকে প্রাক্-হরপ্পা পর্বের একটি কৃষিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে হলকর্ষণের দাগ স্পষ্ট। একই সঙ্গে আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়ি লাঙ্গল চালনার রেখা দেখা যায়। অর্থাৎ লাঙলের ব্যবহার প্রাক্-হরপ্পা আমলেই জানা ছিল। অলচিন দম্পতি মনে করছেন যে লাঙলের ব্যবহার মানে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার; এর ফলে উৎপাদনকে বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। খাদ্য উৎপাদানের এই নতুন পর্যায়কে তারা 'কৃষি বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর ও অন্যান্য শহরের শস্যাগারে এই উদ্বৃত্ত ফসল গুদামজাত করা হত এবং সেটি নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবে করবার জন্যে একটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। হরপ্পীয় সভ্যতার পরিণত স্তরে কৃষি সংগঠন এবং কৃষি ব্যবস্থার উপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল নিয়মিত ঘটনা।

## ২ক.৩ বাণিজ্য

অধ্যাপিকা শিরীন রত্নাগর এনকাউনটার দি ওয়েস্টার্লি ট্রেড দি হরপ্পা সিভিলাইজেশন বইতে 'বৃহত্তর সিন্ধু উপত্যকা'-র ভৌগোলিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করার দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। প্রথমত, উক্ত এলাকার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যর সঙ্গে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের চেয়ে মেসোপটেমিয়া এবং সুমেরু অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যর মিল অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলের কয়েকটি সীমিত এলাকাকে বাদ দিলে ধাতুর উৎস বিশেষ ক্ষীণ। কিন্তু হরপ্পীয় কারিগরেরা ধাতুর ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন এবং যেসব ধাতু হরপ্পীয় সভ্যতার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পাওয়া যেত না তাদের বাণিজ্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হত। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং বহির্দেশীয় বাণিজ্যই হরপ্পার নাগরিকেরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন এবং পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার 'বাণিজ্য' ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা বাণিজ্যের বহু উপাদান আফগানিস্তানের থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। এমনকী, সুদূর ক্রীট, সিরিয়া ও মিশরেও হরপ্পীয় সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। উপাদানগুলির পরিমাণ এবং প্রাপ্ত বস্তুর ধারাবাহিকতা থেকে বাণিজ্য ছাড়া আর কোন সম্ভাবনার

কথা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মনে হয়নি। বস্তুত, বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে হরপ্পীয় সভ্যতাকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত শোর্টুগাই খ্রিঃপূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে এক প্রান্তবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েছিল। হরপ্পা সভ্যতার বহু বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন মূল্যবান পাথর, বিশেষ করে "ল্যাপিস লাজুলী", এখান থেকে সংগ্রহ করে পরে দূরবর্তী দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। বাদখ্‌শনের ল্যাপিস লাজুলী খনির অবস্থান এবং এখান থেকে শোর্টুগাই-এর নৈকট্য ইত্যাদির কারণে শোর্টুগাইকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হত। দক্ষিণ তুর্কমেনিয়াতে হরপ্পীয় যুগের হাতির দাঁতের খেলবার জিনিস, তামার তৈরি জিনিস, সিলমোহর, মাটির পাত্র এবং বিভিন্ন ধরনের পুঁতি পাওয়া গেছে। দক্ষিণ তুর্কমেনিয়াতে তামা বিরল ধাতু, তাই মনে হয় তাম্রনির্মিত জিনিসগুলি সিন্ধু সভ্যতার এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং অধ্যাপক কোহ্ল-এর মতে এই যোগাযোগ ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে হয়েছিল। উত্তর ইরানে হিসার, শাহটেপি, মারলিক ইত্যাদি স্থানে হরপ্পীয় প্রত্নবস্তুর দেখা পাওয়া যায়। শাহবাদে প্রাপ্ত পুঁতিগুলি হরপ্পীয় কারিগরীর নমুনায় তৈরি এবং হরপ্পা থেকে এগুলির আমদানি করা হয়েছে। এ ছাড়াও বৃহৎ স্থাপত্য কীর্তি হিসাবে আক্কাদীয় সভ্যতার আমলে নির্মিত স্থাপত্য নমুনার সঙ্গে হরপ্পীয় শস্যাগারের মিল দেখা যায়। পারস্য উপসাগরের উপকূল অঞ্চলের বহু স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হয়েছে। সেখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তুর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বিভিন্ন ওজনের নমুনা। আকৃতি এবং ওজনের দিক থেকে এরা সম্পূর্ণভাবে হরপ্পীয় এলাকার ওজনের অনুরূপ। বাহরিনের প্রথম বাণিজ্য যোগাযোগ সিন্ধু সভ্যতার মাধ্যমে হয়েছিল এবং বাহরিনের কাছে মেসোপটেমিয়ার চেয়ে হরপ্পীয় বণিকরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্যাপক সিন্ধুদেশের ওজনের ব্যবহার এই প্রবণতার দিকেই ইঙ্গিত করে।

মেসোপটেমিয়াতে বিভিন্ন ধরনের হরপ্পীয় প্রত্নবস্তুর সমাবেশ দেখা যায়। এইসব কারণে স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ হরপ্পা-মেসোপোটেমিয়া বাণিজ্যিক যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। মেসোপটেমিয়ার কিশ অঞ্চলে ১৯২৩ সালে প্রথম সিন্ধুসভ্যতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত সিলমোহর পাওয়া যায়। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে হরপ্পীয় সিলমোহর আবিষ্কার হচ্ছে। সি. জে গাড মেসোপটেমিয়ার উর প্রত্নক্ষেত্র থেকে ১৮টি সিলমোহর আবিষ্কার করেন। এর সঙ্গে হরপ্পীয় সিল সাযুজ্য নিয়ে বহু আলোচনা করা হয়েছে এবং শিলমোহরগুলি যে সিন্ধু-পারস্য উপসাগরীয় এলাকা—মেসোপটেমিয়াতে বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার করা হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া কার্নেলিয়ান পাথরে নির্মিত এবং কার্নেলিয়ান ছাড়াও ল্যাপিস লাজুলী, চ্যালসিডনি, অ্যাগেট ইত্যাদি পাথরের তৈরি পুঁতি সংগ্রহ মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে। এই পুঁতিগুলি ভারতে তৈরি এবং ব্যবসার জন্যে প্রেরিত হয়েছিল এটা ভাববার যথেষ্ট যুক্তি আছে। মেসোপটেমিয়ার টেল আসমার, উব ইত্যাদি স্থানে ভারতীয় পাশা খেলা বোধহয় খুব জনপ্রিয় ছিল; কারণ এইসব স্থানে ভারতীয় ধাঁচে নির্মিত পাশা খেলার গুটি পাওয়া গেছে। এই দৃষ্টান্তকে বাণিজ্য থেকে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি দৃষ্টান্ত বলে ধরতে পারি। আই. ই. ম্যাক, এস. আর. রাও, দিলীপ চক্রবর্তী বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে সিরিয়া, মিশর, ক্রীট ইত্যাদি অঞ্চলেও হরপ্পীয় সভ্যতার যোগাযোগ ছিল।

পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যদি হরপ্পীয় প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়, তাহলে হরপ্পা অঞ্চলে পশ্চিম এশিয় প্রত্নবস্তু পাওয়া দরকার, সেক্ষেত্রেই বাণিজ্য বস্তুর বিনিময় যোগ্যতা প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু হরপ্পীয় এলাকায় বিদেশীয় প্রত্নবস্তুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। শিরীন রত্নাগর সমস্যাটির সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন। তার মতে মেসোপটেমিয়া ভোগ্যপণ্য রপ্তানি করত এবং কৃষির দিক থেকে দুর্বল দেশগুলির কাছ থেকে অন্য পণ্যের বেশী করে দাবি করত। (*এনকাউন্টার,* পৃঃ ৩-৪)

কিছু সিলমোহর এবং অন্যান্য কিছু বিদেশীয় প্রত্নবস্তুর উপস্থিতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে গোলাকার বেশ কয়েকটি সিলমোহর এবং অন্যান্য কিছু বিদেশীয় প্রত্নবস্তুর উপস্থিতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে গোলাকার বেশ কয়েকটি সিলমোহর হরপ্পীয় এলাকায় অনুপ্রবেশকারী সিলমোহর বলা যেতে পারে; এই সিলমোহরগুলি মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, চান্হুদারো, বাহারিন, ফাইলকা অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে। দিলীপ চক্রবর্তী মনে করছেন যে এইগুলি সিন্ধু-পারস্য উপসাগর; মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্যই ব্যবহার করা হত (চক্রবর্তী ঃ *দি এক্সটারনাল ট্রেড অফ্ দি ইন্ডাস সিভিলাইজেশন,* পৃঃ ৪৫)। বহু পূর্বে প্রায় ১৯৩১ সালে মার্শাল হাতির দাঁতের নির্মিত চোঙ-আকৃতির পাঁচটি সিলমোহরের উল্লেখ করেছেন।

মার্শালের অভিমত এই যে সুমাতে প্রাপ্ত সিলমোহরগুলির সঙ্গেই এদের মিল বেশি। বি. বি. লাল কালিবঙ্গানে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চোঙ আকৃতি সিলমোহরের কথা উল্লেখ করেছেন। বিদেশী আকৃতির এই সিলমোহরটিতে কেন দেবতার কাছে নারীবলির চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে? উদ্দেশ্যটি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। পারস্য উপসাগরে নির্মিত সিলমোহর লোথালে পাওয়া যায়, এদের প্রত্যেকটির গায়ে যেসব ছবি আঁকা আছে তা হরপ্পীয় বৈশিষ্ট্যের বিপরীত। শুধু লোথালে নয়, এরকম সিলমোহর হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতেও খুঁজে পাওয়া যায়। নাগপুর মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি সিলমোহরের কথা আলাদা করে বলা যায়; কারণ এই সিলমোহরটির তারিখ ২০০০ খ্রিঃপূঃ বলে নির্ণয় করা সম্ভভব হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এটি ভারতে প্রবেশ করল তার সদুত্তর পাওয়া যায়নি। ফ্রাব্রি ১৯৩৭ সালে মহেঞ্জোদারোতে একটি সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় লেখমালা খুঁজে পেয়েছেন; আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেছেন যে এর সঙ্কেতলিপিগুলি হরপ্পীয় সঙ্কেতলিপির সঙ্গে এককরম নয়; সিলমোহর ছাড়া অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে ডাবারকেটে প্রাপ্ত একটি একটি পাথরের নির্মিত পুরুষ-মস্তক, লোথালে প্রাপ্ত বেশ কিছু মৃৎপাত্রের কথা আলোচনা করা দরকার। লোথালের মৃৎপাত্রগুলি স্পষ্টতই স্থানীয় নির্মাণ নয় এবং যেখানে পাওয়া গেছে সেটি ছিল বণিকদের আবাসস্থল। সুতরাং সমুদ্র বাণিজ্যের সূত্র ধরেই তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। এ ছাড়া, মেহেরগড় (দক্ষিণ সমাধিস্থল), সিগ্রি এবং কোয়টা সমাধিক্ষেত্র থেকে বেশ কিছু হরপ্পা-বহির্ভূত প্রত্নবস্তুর উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

### ২ক.৩.১ বাণিজ্যিক পথ

বাণিজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেলে পরের প্রশ্ন হচ্ছে বাণিজ্যিক পথ কী কী ছিল। দিলীপ চক্রবর্তী ও নয়নজ্যোতি লাহিড়ী বিস্তৃতভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। অধ্যাপিকা লাহিড়ী স্থলপথ ও জলপথ উভয় দিকের রাস্তা সম্বন্ধে গবেষণা করে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত পেশ করেছেন। তিনি উত্তর দিকে আফগানিস্তান-উত্তর ইরান-তুর্কমেনিয়া-মেসোপটেমিয়া অক্ষকে চিহ্নিত করেছেন। আফগানিস্তান থেকে মেসোপটেমিয়ার পথে কার্নেলিয়ান পাথরের পুঁতি, সিন্ধু সভ্যতার চিহ্নিত বিশিষ্ট সিলমোহর পাওয়া গেছে। অক্ষরেখার মধ্যে

শটুগাই, টেপিহিসার, শাহটেপি, কিশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য এশিয়ার মরুভূমির পশ্চিম দিক ধরে যাত্রা করলে এটি ছিল তুলনামূলকভাবে সোজা রাস্তা। দক্ষিণদিকে স্থলপথে মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পার যোগাযোগ রক্ষাকারী বিকল্প একটি পথের কথা অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেছেন—টেপিইয়াহিয়া-জালালাবাদ-কালেনিশার-সুশা-উর। এখানকার প্রতিটি স্থানেই সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। আবার নরম পাথরের (যেমন ষ্টিটাইট/ক্লোরাইট) তৈরি পাত্র প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, পারস্য উপসাগর এলাকা, ইরানে অনেক পাওয়া যায়; এই পাথরের পাত্র তৈরির অন্যতম কেন্দ্র ছিল টেপি ইয়াহিয়া; মহেঞ্জোদারোতেও এরকম নমুনার একটি পাত্র আবিষ্কার করা গেছে। পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় গুজরাট-সিন্ধু উপকূল ধরে তৃতীয় একটি জলপথের রাস্তা ছিল। ডিলমুন থেকে হরপ্পার মধ্যে কয়েকটি হরপ্পীয় উপকূল এলাকার কথা জানা যায়। এদের মধ্যে মাকারন উপকূলের ঘুটকাজেন-দর এবং সোটকা-খো বেশ বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী এলাকা ছিল।

হরপ্পীয় সভ্যতা মেসোপটেমিয়া/ইরান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল কিনা তা নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। এখন আলোচনা করা যেতে পারে যে বহির্বাণিজ্যের পণ্যসামগ্রী কী কী ছিল। লোথাল এবং সিন্ধু সিলমোহর থেকে এবং গজ মাপার দণ্ড থেকে এটা মনে হয় যে সুতিবস্ত্র রপ্তানির দ্রব্য ছিল। দিলীপ চক্রবর্তী এবং রত্নাগর দুজনেই মনে করেন যে, হাতির দাঁতের প্রস্তুত জিনিস ব্যাপকভাবে রপ্তানি হত। রত্নাগর ল্যাপিস লাজুলী পাথরের বিনিময় যোগ্যতা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন; চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছেন যে বাদখ্শান থেকে ল্যাপিস সংগ্রহ করে সেগুলি কি পুনরায় মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে রপ্তানি করা হত কিনা। প্রশ্নটির উত্তর সহজ নয়। জর্জিনা হেরম্যান জানাচ্ছেন যে, সিন্ধু অঞ্চল থেকে ল্যাপিস রপ্তানী হত ঠিকই কিন্তু দুটি ল্যাপিসের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের মেসোপটেমিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে জানা সম্ভব নয় যে, সিন্ধু অঞ্চল থেকে কোন ধাতু বা ধাতব দ্রব্য রপ্তানি করা হত কিনা। প্রশ্নটি জরুরি, কারণ ব্রোঞ্জ যুগে যন্ত্র এবং অস্ত্র তামা ও টিন দিয়ে তৈরি হত; সমস্ত কারিগরী বিদ্যা ব্রোঞ্জ ও টিনের সংগ্রহের উপর নির্ভর করত। হরপ্পীয়রা ওমান থেকে তামা সংগ্রহ করত।

রাজস্থান ও গুজরাটে, বিশেষ করে, রাজস্থানের তাম্র খনিগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হত। গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য কাজে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে ভাল কাঠ পাওয়া যেত না। তাই প্রাচীন মেসোপটেমিয়া লেখমালায় দিলমান, মগন, মেলুহার বিভিন্ন কাঠের কথা উল্লেখ করা আছে। বাস্তবিক, দামী কাঠই বোধহয় ছিল হরপ্পা ও মেলুহার প্রাথমিক বাণিজ্যিক বিনিময় বস্তু। এ ছাড়াও, শিরীন রত্নাগর সোনা, রূপা এবং মূল্যবান পাথরের বাণিজ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বৈদেশিক বাণিজ্য হরপ্পার অর্থনীতির সমৃদ্ধির পক্ষে কত জরুরি ছিল।

হরপ্পীয় মেসোপটেমিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে তিনটি অঞ্চলের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে, তারা হল টিলমুন/ডিলমুন, মগন ও মেলুহা। ডিলমুন-এর অবস্থান নিয়ে সন্দেহ নেই। আধুনিককালের বাহরিন ছিল সেকালের ডিলমুন। মগন ও মেলুহা-র আধুনিক ভৌগোলিক অবস্থান কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন স্থানের নির্দেশ করেছেন কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক সরবার্জার মনে করছেন যে মগন ও মেলুহা মেসোপটেমিয়া থেকে অত্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চল নয়; এটি এমন স্থানে অবস্থিত যেখান থেকে সামরিক অভিযান এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক উভয় বজায় রাখা যায়। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্রা মেলুহাকে

সিন্ধু প্রদেশের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। মেসোপটেমিয়ার বাণমুখলিপিতে লিখিত নথিতে মেলুহা ভাষার দোভাষীর উল্লেখও পাওয়া যায়। এটি নিম্ন সিন্ধু এলাকার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের স্পষ্ট প্রমাণ। 'মাগান'কে আগে মাকারাস উপকূলের সঙ্গে সনাক্ত করা হত। সম্প্রতি পুরাবিদ্‌রা 'মাগান'কে ওমান উপকূলের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। কারণ হিসাবে তারা বলেছেন যে লেখমালায় মেলুহা থেকে আগত বস্তুগুলি অধিকাংশই সিন্ধু অঞ্চলের নিজস্ব জিনিস। মেলুহার ময়ূর মেসোপটেমিয়ার রাজপ্রাসাদে শোভা পেত এবং কালো জাতের বিশেষ মেলুহার মুরগীর কথা বারবার বলা হয়েছে যাদের হাড় হরপ্পীয় অঞ্চলের রূপারে পাওয়া গেছে। তা ছাড়া, মেলুহার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের কথাও তাঁরা লিখেছেন। তৃতীয়ত, মেলুহার নৌকা, মূল্যবান ও কম মূল্যবান পাথর, বিভিন্ন ধরনের পাথর ইত্যাদির উল্লেখ প্রাচীন মেসোপটেমিয় গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে— এই সমস্ত জিনিসই ছিল সিন্ধু এলাকার নিজস্ব জিনিস। সমুদ্রপথে ২৩৩৪-২২৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে মেলুহার সঙ্গে সমুদ্রপথে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এবং এই যোগাযোগ পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল; সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এখন এটা বলা যাবে যে সিন্ধু উপত্যকাকে প্রাচীন মেসোপটেমিয় লেখতে মেলুহা বলে উল্লেখ করা হত।

বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে বাণিজ্যের প্রকৃতি কী ছিল তা জানা দরদকার। বাণিজ্য শুধু এক স্থানের পণ্য অন্য স্থানে বিতরণ নয়। এর মধ্যে পণ্যদ্রব্যগুলির উৎপাদন এবং ভোগ করাকে যুক্ত করতে হবে।

## ২ক.৪ সমাজ ও ধর্মীয় জীবন

হরপ্পীয় সভ্যতার পতনের কারণ বিশ্লেষণের আগে তাদের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন আছে বলে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।

সিলমোহরগুলি অপঠিত থাকা সত্ত্বেও প্রত্নবস্তুর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে হরপ্পীয় জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। যদিও কোনো প্রথাগত মন্দির পাওয়া যায়নি তবুও মহেঞ্জোদারোতে দুর্গ এলাকায় এবং নীচের তলার শহরের বেশ কয়েকটি বাড়িকে মন্দির বলে ভাবা যেতে পারে, কারণ বহু ধর্মীয় মূর্তি এইসব বাড়িগুলি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মার্শাল হরপ্পীয় সভ্যতার ধর্ম আলোচনার সময় কতকগুলি মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। পোড়া মাটির নির্মিত স্ত্রীমূর্তিগুলিকে তিনি মাতৃকা শক্তির আধাররূপে কল্পনা করেছেন। মার্শালই প্রথম বিশেষ একটি মূর্তিকে শিব-মূর্তি বলে দাবী করেছেন কারণ তাঁর মতে, পরবর্তীকালে শিবের বৈদিক ধারণার সাথে এই মূর্তির আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যোগাসনে উপবিষ্ট এবং বিভিন্ন পশু দ্বারা বেষ্টিত; মস্তকে মহিষের শিং শোভিত এই মূর্তিকে শিব ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায়নি। পাথরের লিঙ্গ মূর্তি এবং যেসব বাড়িতে এই লিঙ্গ মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে তা বোধহয় এই দেবতাকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল।

### ২ক.৪.১ অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস

তাবিজ এবং সিলমোহরে অন্য আর এক ধরনের মূর্তি পাওয়া গেছে যার মধ্যে একরকমের অতিপ্রাকৃতিক ধারণা লক্ষ্য করা যায়। এই মূর্তিগুলির মাথায় শিং এবং পশ্চাদ্দেশে একটি লেজ আছে এবং কোন কোন

সময় এই মূর্তিগুলির পা-গুলি খুরবিশিষ্ট। এ ছাড়াও তাবিজ, সিলমোহরের তামার ফলকে নানা ধরনের মূর্তি পাওয়া যায় যা বিশেষ ধরনের দৈবী বিশ্বাসের ইঙ্গিত করে, যেমন—একটি সিলমোহরে সর্প পরিবেষ্টিত যোগী চেহারার মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিটিকে দেবমূর্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। সিন্ধু অধিবাসীদের কল্পনায় বৃক্ষদেবতাও উপস্থিত ছিলেন। কোন কোন মূর্তিতে মেসোপটেমিয়ার পুরাণে উল্লিখিত গিলগামেশের ছাপ পাওয়া যায়; এই ছাপে দেখা যায় যে একজন মানুষ দুহাতে দুটি বাঘকে ধরে আছেন; আবার শৃঙ্গবিশিষ্ট একটি মানুষ পাওয়া গেছে যার পা এবং লেজ ঠিক বলদের মতো যাকে মেসোপটেমিয়াতে এনকিডু নামে পশু মানুষ ভাবে কল্পনা করা হয়েছে। কোন কোন সময় ষাঁড় বা বাইসনের মাথা থেকে একটি গাছের সৃষ্টির কথা কল্পনা করা হয়েছে। ষাঁড় এবং গরুকে দেব-দেবীর মূর্তি কল্পনার সময় নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিমূর্ত ধর্মীয় কল্পনার মধ্যে স্বস্তিকা চিহ্ন ব্যবহার করার কথা ভাবা যেতে পারে যার ধারাবাহিকতা আজকের ভারতীয় হিন্দুধর্মে অব্যাহত।

কালিবঙ্গানে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন হরপ্পীয় সভ্যতার ধর্মবিশ্বাসে একটি সাম্প্রতিক সংযোজন। এখানে মন্দিরের ধারণা সম্বলিত বেশ কয়েকটি বাড়ি পাওয়া গেছে। ইঁটের গাঁথুনি বেশ কয়েক সারি উঁচুতে উঠে গেছে এবং উঁচু চাতালটিতে অগ্নিবেদী, কূপ, স্নান করবার স্থান পাওয়া যাচ্ছে এবং ইঁটের তৈরি একটি গর্ত শুধুমাত্র ছাই এবং পশুর হাড়ে ভর্তি। এই এলাকাটি নিশ্চিতভাবে সমবেত দেবার্চনার স্থান ছিল—যেখানে পশুবলি, পূণ্যস্থান, অগ্নি উপাসনা নিয়মিতভাবে করা হত। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে দুর্গ এলাকা ছাড়াও নীচের তলার বাড়িগুলিতে একটি স্থান অগ্নিসংরক্ষণের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। এই কক্ষটিকে অগ্নিশালা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রথাটি গৃহস্থদের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা হয়।

অন্য জায়গায় অগ্নিবেদী আবিষ্কার করা হয়েছে; পাশাপাশি ছাই-এর গর্তও পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু আর কিছু নয় কেন? অলচিন দম্পতি মনে করেন যে নীচের তলার লোকেরা শহর এলাকার লোকেদের চেয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব দিত।

সংক্ষিপ্তভাবে এটা বলা যেতে পারে যে—পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার ধর্মীয় ধারণায় নানারকম স্রোত এসে মিশেছে। একটি স্রোত অবশ্যই প্রাক্-হরপ্পীয় সভ্যতা থেকে উপস্থিত হয়েছে এবং তাকে বেগবান করেছে; কিন্তু বৈদিক সভ্যতার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য যখন হরপ্পার সভ্যতায় লক্ষ্য করি তখনই জটিলতার সৃষ্টি হয়। অগ্নি-উপাসনা সুনিশ্চিতভাবে ইন্দো-আর্যদের উপাসনা পদ্ধতি। অগ্নিশালা পূজা-বেদির দ্বারা আমরা কি প্রমাণ করতে পারি যে, আর্যরা ১৫০০ খ্রীষ্টপূব্দাদের বহু পূর্বে ভারতে উপস্থিত হয়েছিলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগে আরও অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ এই প্রশ্নটির সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার পতনের কারণ-সম্পর্কিত সমস্যাটি বিশেষভাবে জড়িত আছে।

### ২ক.৪.২ ধর্মবিশ্বাস ও ক্ষমতাবিভাজন

ব্রিজেট অলচিন সম্পাদিত—*সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজি* পুস্তকে ইলডিকো পুস্‌কাস্ সিন্ধুসভ্যতার ধর্মসম্বন্ধে নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, সিন্ধুসভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী বিকাশ এবং পতনের সঙ্গে সিন্ধু অধিবাসীদের ধর্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাঁর মতে, কোনও একজন ব্যক্তি নয়, পুরোহিতগোষ্ঠী সমবেতভাবে

সিন্ধুসভ্যতার রাষ্ট্রব্যবস্থা, উৎপাদন, বিপণন এবং দূরপাল্লার বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। অধ্যাপিকা পুস্‌কাসের কথা ঠিক হলে আমরা কোশাম্বীর কথা মেনে নেব যে এই পুরোহিতগোষ্ঠী পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করত—কারণ পরিবর্তন তাদের কাছে লাভজনক নয়; এর ফলে যে অচল অবস্থা ও স্থাণুত্ব দেখা যায় তা সিন্ধুসভ্যতার পতনকে ডেকে আনে। পুরোহিতগোষ্ঠী, বণিক-সম্প্রদায়, কারিগর এবং বোধ হয়, গ্রামের প্রধান যারা (গ্রামণী) ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী জনগণের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। স্বাভাবিকভাবেই শহর ও গ্রাম এবং ক্ষমতাহীন এবং ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব বিরাজ করত এবং এর থেকেই কি পরে আর্যদের বর্ণব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল? এই দ্বন্দ্বকে সমাধান করবার ব্যর্থতাই পরবর্তীকালে হয়তো পুরাহিততন্ত্র-পরিচালিত সিন্ধু রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ডেকে এনেছিল।

এ ছাড়াও, অধ্যাপিকা পুস্‌কাস্‌ সিন্ধুসভ্যতার দেব-দেবীকে দুভাগে ভাগ করেছেন। একটি ভাগে লোকায়তদের দেবীকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি; মাতৃকাশক্তি, লিঙ্গ পূজাকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়; আর একটি ভাগকে হরপ্পীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে ভাবা যেতে পারে। চতুর্মুখবিশিষ্ট দেবতা—যিনি সৃষ্টি এবং ধ্বংসের প্রতীক, তিনি সাম্রাজ্যবাদী সিন্ধুবাসীদেরও দেবতা ছিলেন বলে মনে করা যায়। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কীভাবে এইসব দেবতারা হিন্দুধর্মে স্থান করে নিয়েছিলেন তা গভীর গবেষণার বিষয়। সিন্ধুসভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর বোধহয় এইসব দেবতারা তাদের জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। কীভাবে এবং কেন? তার উত্তর ভবিষ্যৎ-গবেষকদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। স্বাভাবিকভাবে এই কাজে সমাজের একাধিক শ্রেণী যুক্ত থাকে। শ্রেণীগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের উপর বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

সাম্প্রতিককালে হরপ্পার বাণিজ্য নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং হরপ্পীয় বাণিজ্য নিয়ে তারা নানারকম মতামত প্রকাশ করেছেন। হরপ্পীয় সভ্যতার ভূমিকায় বাণিজ্যের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে শিরীণ রত্নাগর হরপ্পাকে মেসোপটেমিয়ার উপনিবেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হরপ্পার শ্রমজীবী জনগণ মেসোপটেমিয়ার মন্দির এবং বণিকশ্রেণীর চাহিদা মেটাবার জন্যে উৎপাদন করত। অধ্যাপক বি. এম. পাণ্ডে এবং অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী তার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। অধ্যাপক চক্রবর্তী হরপ্পীয় বাণিজ্যের সংগঠিত এবং অসংগঠিত দুটি চরিত্র ছিল বলে মনে করেন। হরপ্পা এবং মেসোপটেময়ার অন্তর্বর্তী উপজাতীয় গোষ্ঠীরা বাণিজ্য-প্রক্রিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতেন। ঘটনা যাই ঘটে থাকুক, খ্রিস্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দের মধ্যে এই বাণিজ্য লুপ্ত হয়ে যায়।

## ২.৫ সভ্যতার পতন

এখানে সভ্যতার উত্থানের মতো তার পতনও ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের বিস্মিত করে। কীভাবে সহস্রাধিক বছরকাল স্থায়ী হবার পর কোনরকম উত্তরসূরি না রেখে হরপ্পীয় সভ্যতার বিলোপ ঘটল? কোন্‌ কোন্‌ ঐতিহাসিক ঘটনা এর পিছনে দায়ী? কীভাবে এই পতনকে প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? ভারতীয় সভ্যতার পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে হরপ্পীয় সভ্যতার প্রভাব আছে কি? এ সমস্ত এবং আরো অনেক প্রশ্ন ঐতিহাসিক এবং

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের আলোড়িত করে। এই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তরের মধ্য দিয়েই কোন একটি সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব।

হরপ্পীয় সভ্যতার পতনের জন্যে নানারকম কারণ নির্দেশ করা হলেও দুটি প্রধান কারণের কথা প্রায় সকলেই আলোচনা করেছেন। (এক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (দুই) হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। হুইলার মনে করছেন, এই সভ্যতার শেষও শুরুর মতো কম আকর্ষণীয় নয়। দ্বিতীয়ত, হরপ্পীয় সভ্যতা বহুদূর বিস্তৃত; প্রত্যেক স্থানে একই রকম কারণের জন্য পতন আসেনি। আধুনিককালের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা সেই কথাই প্রমাণ করে।

### ২ক.৫.১ বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়

নীলনদের বন্যার মতো সিন্ধুনদের বন্যা ছিল প্রতি বৎসরের এক স্বাভাবিক ব্যাপার। এই বন্যার ফলে জমির উর্বরতা বাড়ত এবং অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন হত। কিন্তু অস্বাভাবিক এবং দীর্ঘস্থায়ী বন্যা মহেঞ্জোদারো শহরের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। খননকার্যের ফলে অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে কমপক্ষে তিনবার ব্যাপক হারে বন্যা দেখা দেয় যার হাত থেকে শহরকে রক্ষা করা সম্ভভব হয়নি। বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বাড়িগুলি কাঁচা ইঁটের বদলে পাকা ইঁট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। বন্যার জল যাতে নগরদুর্গকে ধ্বংস করতে না পারে সেজন্য প্রায় ৪৫ ফুট চওড়া একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। উঁচু পাটাতনের উপর বাড়িগুলি তৈরি করা হত। লোথালের কাছে কোলহ নামে একটি জায়গায় জমাট পলিমাটির অবস্থিতির দরুন এটা অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে এই জায়গাটি বন্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এস. আর. রাও মনে করেন যে লোথাল, দোলপারা, রংপুর বন্যার ফলে ধ্বংস হয়েছিল। ভূপৃষ্ঠগত ভয়াবহ পরিবর্তনের ফলে এরকম বন্যা সম্ভব হয়েছিল। বন্যার ফলে শহর পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে দেখা গেছে। অধ্যাপক ফেয়ারসার্ভিস বন্যার আর একটি দিকের কথা আলোচনা করেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে কিন্তু মহেঞ্জোদারোর নগরীয় আয়তন বোধহয় প্রসারিত হয়নি; তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে একটা তাগিদ ছিল বন্যা-অধ্যুষিত অঞ্চলের কাছাকাছি বাস করার; বিশেষ করে কৃষিজীবী জনগণের মধ্যে এই চাহিদা বেশি হওয়া সম্ভব; অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে নগরীয় পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

### ২ক.৫.২ কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন

আকর্ষণীয় আর একটি সমস্যা হল হরপ্পার খাদ্য-উৎপাদন। হরপ্পীয় সভ্যতার প্রায় সমস্ত অঞ্চল প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল গম-উৎপাদক অঞ্চল। গুজরাট, আলমগীরপুর, তাপ্তী নদীর উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে বোধহয় পরবর্তীকালে চাল উৎপাদনের একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে হরপ্পীয় কৃষকেরা গম উৎপাদক-এলাকার বাইরে কোন বসতি করেনি; কারণ সেখানে তাদের কৃষিপদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে না। গম থেকে চালের উৎপাদনে চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে—গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং দাক্ষিণাত্যের উপকূল এবং মালভূমি এলাকা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। হরপ্পীয় অঞ্চল পরিত্যাগ করে নতুন এলাকায় জনবসতি স্থাপন করার পক্ষে কোন বাধা রইল না। যদিও এটি অনুমান কিন্তু এটি সত্য যে, আর্যরা আসবার আগে প্রাক্-আর্য জনগণ মধ্যগাঙ্গেয় এবং নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় ধান চাষ করতে পারত। এই প্রাক্-আর্য কারা ছিলেন?

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অপর একটি কারণ বোধহয় বৃক্ষচ্ছেদন; গৃহস্থালীর প্রয়োজনে, শিল্পের প্রয়োজনে,

বিশেষ করে, লক্ষ লক্ষ ইঁট তৈরির কাজে অসংখ্য গাছ উৎপাটিত করতে হয়েছিল। এর ফলে, সবুজ বনানী শুষ্ক মরুপ্রায় এলাকায় পর্যবসিত হয়েছিল। এ ছাড়াও, একই জমি বারংবার চাষ করা, জলসেচের নালাগুলির অবহেলা ইত্যাদিও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গৌণ উপকরণ বলে ধরা হবে।

হরপ্পা সভ্যতার নগরায়ণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পৌর-কর্তৃপক্ষের অস্তিত্বের কথা বারংবার বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হয় এরা ক্ষমতাবিহীন হয়েছিলেন অথবা পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে তাদের কিছু করার ছিল না। মহেঞ্জোদারোতে পরবর্তী পর্যায়ে নগর-স্থাপত্যের ক্রম-অবনতির ছাপ স্পষ্ট। পুরোনো ইঁট ব্যবহার করে নতুন বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে; জনসাধারণের ব্যবহৃত রাস্তা অবরোধ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে শহরটির প্রায় বিপর্যস্ত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

আবার আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কৃষির পশ্চাৎপদতা নিয়ে আলোচনা করেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি-অর্থনীতি প্রসারিত না হওয়ায় অর্থনৈতিক জীবনে জড়ত্ব দেখা দিয়েছিল। কোশাম্বী মনে করেন যে, লৌহজাত উপকরণের সঙ্গে পরিচয় না থাকার ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকার ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে ব্যাপক পরিমাণে কৃষি উৎপাদন ঘটানো সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া, সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পক্ষান্তরে যখন আমরা লক্ষ্য করব যে সুমেরীয় এলামাইটদের তুলনায় হরপ্পীয়দের ধাতুবিদ্যার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত এবং সাধারণ মানের, তখন বুঝতে হবে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় তারা সমসাময়িক সভ্য জাতিদের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। ল্যামবার্গ কার্লোভস্কির মতে, হরপ্পা সভ্যতার প্রথম থেকে শেষ অবধি কারিগরী বিদ্যা—বিশেষ করে, ধাতব বিদ্যার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া, প্রতিরক্ষার অস্ত্র যেমন কুঠার, ছোরা ইত্যাদির ঢালাই-ছাঁচ অতি সাধারণ মানের। হরপ্পীয় প্রত্নবস্তুর মধ্যে কৃষিতে ব্যবহৃত উপাদানগুলির অতি সামান্যই ব্রোঞ্জ নির্মিত; অতিশয় রক্ষণশীল চিন্তাভাবনার ফলে বোধহয় কৃষিতে ধাতুর ব্যবহার সীমিত। কাস্তে, লাঙল, নিড়ানিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় পাথর বা শক্ত কাঠের তৈরি। কৃষিতে তামা-ব্রোঞ্জ ইত্যাদির ব্যবহার সীমিত, কিন্তু প্রস্তর-শিল্পে, হাতির-দাঁতের জিনিস নির্মাণের সময় নানা ধরনের তামা-ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। কেন? মুষ্টিমেয় জনগণের শৌখিনতা মেটাবার প্রয়োজনে উন্নত কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ হচ্ছে অথচ বৃহত্তর জনগণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের সময় রক্ষণশীলতা, এটা কি সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার পরিচায়ক নয়?

## ২ক.৫.৩ বাণিজ্যমুখী অর্থনীতির ভূমিকা

শিরীন রত্নাগর প্রমাণ করেছেন যে হরপ্পীয় নাগরিক সভ্যতার অস্তিত্বের জন্যে ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রয়োজন ছিল। শিল্পের প্রয়োজনে বহু জিনিস ব্যবহার করতেন যা স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করা যেত না। হরপ্পীয় নাগরিক সভ্যতা বজায় রাখবার জন্যে দূরপাল্লার বাণিজ্য একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল। বিপরীতক্রমে—দূরপাল্লার বাণিজ্য ছিল বলেই বোধহয় হরপ্পীয় নাগরিক সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিল। পাঁচশত বছরের অধিক এই বাণিজ্য-সম্পর্ক টিকে ছিল এবং এর ফলে, রত্নাগরের মতে হরপ্পীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং তার কেন্দ্রাতীত ব্যবস্থা এবং উৎপাদনের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গড়ে উঠে। বাণিজ্যের ফলে পরিশীলিত নাগরিক সভ্যতা, বণিকশ্রেণী গড়ে উঠে। যদি এই বৈদেশিক বাজার, হরপ্পীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং বণিকশ্রেণী হাতছাড়া হয়ে যায়, নিশ্চিতভাবে তার গুরুতর প্রতিক্রিয়া হরপ্পা সভ্যতার উপর পড়বে। রাষ্ট্রের সম্পদ ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছিল; সামগ্রিক উৎপাদন-

ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছিল—যার ফল গ্রামীণ জনতাকেও ভোগ করতে হয়েছিল। কর্মহীন শহরবাসীগণ নগর পরিত্যাগ করে গ্রামের দিকে যাত্রা করলে সনাতনগ্রামীণ জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতায় আঘাত করে। এই অবস্থায় হরপ্পীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সভ্যতার পতন ঘটবে কোন সন্দেহ নেই।

### ২ক.৫.৪ অভিনবত্ব-সৃজনের অভাব

হরপ্পীয় সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অভিনবত্বের সুযোগ ছিল অল্প। পুরাতন প্রথার দুর্বলতাকে দূর করে তাকে যুগোপযোগী করে নেওয়ার মানসিকতা তাদের ছিল না। অধ্যাপক কোশাম্বী এই পরিবর্তনহীনতাকে দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা হিসাবে তিনি ধর্মের প্রাধান্যের কথা চিন্তা করেছেন। সামাজিক জীবনের স্থাণুত্বের জন্যে ধর্মকে দায়ী করা যায়। কয়েক সহস্রাধিক বছর ধরে হরপ্পীয় সভ্যতায় অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু কোন পরিবর্তন নয়। মেসোপটেমিয়া এবং সুমেরীয় শহরগুলি ধ্বংস হয়ে যাবার পর নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর শহর বন্যায় ধ্বংস হয়ে যাবার পর একইভাবে তৈরি করা হয়, মৃৎপাত্র নির্মাণের কৌশল এবং আকৃতি প্রথম থেকে শেষ অবধি একই থাকে, ব্রোঞ্জের যন্ত্রগুলি একই রকম দেখতে এবং একই রকম তাদের উপযোগিতা। সবচেয়ে বড় কথা, লিখিত বর্ণমালার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই হরপ্পীয় লিপিতে কোন বৈচিত্র্য নেই; স্থায়ী বিষয়বস্তুতে দীর্ঘস্থায়ী কোন বক্তব্য উপস্থিত করার প্রবণতা দেখা যায় না। হরপ্পীয় সংস্কৃতির এই অস্বাভাবিকতাকে কোশাম্বী ব্যাখ্যা করেছেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। সমাজের সমস্ত সুযোগসুবিধা যদি মুষ্টিমেয় শ্রেণী ভোগ করে তাহলে পরিবর্তন তাদের কাছে লাভজনক নয়; অপর শ্রেণীর কাছে পরিবর্তন অপ্রয়োজনীয়।

কিন্তু অলচিন দম্পতি তাদের সাম্প্রতিক *দি অরিজিন অফ্ দি ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন* বইতে এই সমস্যা আর একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সমগ্র হরপ্পীয় সভ্যতায় কোন পরিবর্তন হয়নি তা তারা মানতে চান না; কারণ তাহলে (ক) হরপ্পীয় সভ্যতাকে প্রাক্-হরপ্পীয় এবং পরিণত হরপ্পীয়—এই দুই পর্যায়ে ভাগ করার কোনো দরকার হত না; (খ) তাদের মতে আনুমানিক ২৬০০ খ্রিঃপূঃ সময় থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা যায়। পরিবর্তনের ক্ষেত্র হিসেবে কয়েকটি দিককে তারা ধরেছেন, একটি হল ঃ (১) লিখিত লিপির উদ্ভব, (২) শিল্প ও কলাবিদ্যার কয়েকটি দিকে বিশেষীকরণ, (৩) বাণিজ্য। কিন্তু অলচিন দম্পতির বক্তব্য দ্বারা কোশাম্বীর বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যাঁরা ক্ষমতা ভোগ করেছেন পরিবর্তনের সুযোগ তাঁরাই নিয়েছেন।

### ২ক.৫.৫ অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান

হুইলার অনুমানভিত্তিক এসব কারণকে এড়িয়ে প্রত্নতত্ত্বভিত্তিক কারণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তার বক্তব্য এই যে আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের দ্বারা এই সভ্যতা যখন জরাজীর্ণ তখন বৈদেশিক আক্রমণ চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টান্ত থেকে অন্তত ছ'টি নমুনা তিনি তুলে ধরেছেন যেখানে অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। ডি. কে. এলাকাতে চারিটি কঙ্কাল নিয়ে বিশ্লেষণ করার সময় দেখা যাচ্ছে তাদের মৃত্যু হত্যা থেকে হয়েছে। এইচ. আর. এলাকায় পাঁচ নম্ভর বাড়িতে তেরো জন বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ এবং একজন শিশুর কঙ্কাল দেখা যায়; মনে হয় এদের একই সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে। এদের মধ্যে কোন একটি কঙ্কালের মাথায় ১৪৬ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি ক্ষতচিহ্নের দাগ আছে। জীবিত অবস্থায় কোন ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করার ফলে এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালের আরও কয়েকটি

কঙ্কালের কথা বলা হয়েছে, যেখানে কোনরকম রীতি না মেনেই মৃতদেহগুলিকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। কুয়োর ধারে শায়িত অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের কঙ্কাল—সমস্ত কিছুই আক্রমণ ও বিপদের দিকে আঙুল নির্দেশ করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আক্রমণকারী কারা? এরা আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের পাহাড়ী এলাকা থেকে আগত উপজাতি হতে পারে অথবা, মধ্য এশিয়া থেকে আগত আর্যজাতিও হতে পারে। হুইলার যেখানে দুটি বিকল্পের কথা ভেবেছেন। কোশাম্ভবী কিন্তু স্থির নিশ্চিত যে আক্রমণকারীরা আর্য। *ঋগ্বেদ*-এ প্রায়শঃ "অশ্বময়ী নগরী" ও "পুর" ধ্বংস করার কথা বলা হয়। পুর ধ্বংস কারণ বলে আর্যদেবতা ইন্দ্রকে "পুরন্দর" বলে অভিহিত করা হয়। যতদিন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর প্রাচীর-বিশিষ্ট দুর্গগুলি আবিষ্কৃত হয়নি ততদিন এই শ্লোকগুলিকে কল্পনা বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু এখন এইসব বক্তব্যের পিছনে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আছে ভাবা যেতে পারে, বিশেষ করে হরপ্পীয় সভ্যতা এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত যাকে আর্যরা "সপ্তসিন্ধবঃ" বলে উল্লেখ করেছেন।

আর. এ. ই. কানিংহাম *আর্কিওলজি অফ্ আর্লি হিস্টরিক্ সাউথ এশিয়া* বইটিতে এই ব্যাপারটিকে প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৭০০ অব্দ পর্যন্ত হরপ্পা-সভ্যতা একটি পর্যায়ে উন্নীত হয় যাকে নাগরিক সভ্যতার পরবর্তী পর্যায় বলা যায়; এই পর্যায়ে শিল্পায়ন এবং বর্ণমালা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ ছাড়া, পশ্চিম এশিয়ার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সেখানকার জনগণের উন্নততর দক্ষিণ এলাকায় গমন করার প্রবণতা থাকতে পারে। চানহুদারো, ঝুকার, আম্রি প্রভৃতি এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা বহিরাগতদের আগমনের তত্ত্ব ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। চানহুদারোতে এই পর্যায়ে যেসব মৃৎপাত্র পাওয়া যাচ্ছে তা হরপ্পীয় মৃৎপাত্রের কারিগরী ও শৈলী থেকে পৃথক। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই পর্যায়ে চানহুদারোতে কোন হরপ্পীয় সিলমোহর পাওয়া যায়নি। পাথর, ধাতু ইত্যাদি নির্মিত যেসব সিলমোহর পাওয়া গেছে তা পশ্চিম থেকে আগত বিদেশীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে; কারণ অনুরূপ সিলমোহর পূর্ব ইরান, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়াতে পাওয়া গেছে। এ ছাড়াও কয়েক ধরনের তামার যন্ত্র এবং পিচের কথাও বলা দরকার যারা কোনক্রমেই স্থানীয় নয়, বিদেশী কারিগরদের হাতের তৈরি। হরপ্পীয় সিলমোহরের অনুপস্থিতি কি হরপ্পীয় রাষ্ট্র-ক্ষমতার অনুপস্থিতি বলে ধরে নেওয়া যাবে? শুধু চানহুদারো, ঝুকার নয়, মেহেরগড়ের সাম্প্রতিকতম পর্যায়ে, কোয়েটা এবং তার নিকটবর্তী পিয়ক অঞ্চলের সর্বত্র হরপ্পা-বহির্ভূত এক ঐতিহ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পাতে "সিমেট্রি এইচ."-এ এক বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছিল। হরপ্পার দুর্গ এলাকার এ. বি. টিবিতেও অনুরূপ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। "সিমেট্রি এইচ."-এর মৃৎপাত্রগুলি পরীক্ষা করে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুমোর-সমাজ পুরোনো কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে নতুন খরিদ্দারের চাহিদা মিটাবার জন্যে নতুন ভঙ্গি অনুসরণ করছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভাট এই নবাগতদের ইন্দো-আর্য বলে অভিহিত করেছেন। শুধু মৃৎপাত্র নয়, এরা নতুন ধরনের ছিদ্রযুক্ত শিল, নতুন ধরনের কুঠার ব্যবহার করেছেন যা পূর্বে কখনোই ব্যবহৃত হত না। আরও পূর্ব দিকে কালিবঙ্গানে উপস্থিত বলে দেখতে পাওয়া যাবে—একেবারে উপরের দিকে এক ধরনের পাত্র যা ইন্দো-আর্যরা অগ্নি উপাসনার সময় ব্যবহার করতেন এবং এই চিহ্নটি যদি ঠিক হয় তাহলে হরপ্পীয় সভ্যতার মাঝেই আর্যদের উপস্থিতি ঘটেছিল এরকম ভাবা যেতে পারে। "সিমেট্রি এইচ."-এর বহিরাগতরা জনগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তাদের শিল্প-কৌশল করায়ত্ত করে নতুন ব্যবস্থা তাদের জমির উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে—যার স্পষ্ট প্রমাণ বোঝা যায় সমাধিস্থলে পরিবর্তিত নিয়মের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্গত যে বিশাল সাম্রাজ্য তাকে কি আর্যরা এককভাবে ধ্বংস করতে পেরেছিল? সমগ্র হরপ্পীয় অঞ্চলের পতনের জন্য কোন একটি কারণকে দায়ী করা যাবে না, আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের সঙ্গে অন্যান্য কারণগুলি বিভিন্ন সময়ে কম-বেশি যোগ দিয়ে এই সভ্যতার পতনকে ডেকে এনেছিল বলে মনে হয়।

## ২ক.৬ অনুশীলনী

**রচনাভিত্তিক প্রশ্ন**

১। উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রাক্-হরপ্পা স্তর থেকে পরিণত হরপ্পা-সভ্যতায় বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা করুন।

২। হরপ্পীয় সংস্কৃতির বৈদেশিক বাণিজ্য কীভাবে পরিচালিত হত? বাণিজ্যের সংগঠন, বিষয়বস্তু, বাণিজ্যপথ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতামত ও পরস্পর বিরোধিতার উল্লেখ করুন।

৩। আর্যরা বা কোন বৈদেশিক জাতি হরপ্পীয় সভ্যতা ধ্বংস করেছিল—প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে কীভাবে তা প্রমাণ করা যায়?

**সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

১। হরপ্পীয় সভ্যতার বিস্তার কীভাবে হরপ্পীয় সভ্যতা সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করে?

২। হরপ্পীয় সভ্যতার পতনের জন্যে আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়কে কীভাবে দায়ী করা যায়?

৩। সিন্ধুসভ্যতার বদলে আধুনিক কালে কেন হরপ্পা-সভ্যতা বলা হয়?

**বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন**

১। মহেঞ্জোদারোর স্নানাগারটির আয়তন কত ছিল?

২। লাপিস-লাজুলী কোথায় পাওয়া যেত?

৩। ডিলমান, মগন, মেলুহার কোথায় অবস্থিত বলে অনুমান করা হয়?

## ২ক.৭ গ্রন্থপঞ্জী


১। দিলীপ চক্রবর্তী ঃ *দ্য আর্কিওলজি অফ্ এনসেন্ট ইন্ডিয়ান সিটিস্*

২। দিলীপ চক্রবর্তী ঃ *দ্য এক্সটারনাল ট্রেড অফ্ দ্য ইন্ডাস সিভিলাইজেশন*

৩। শিরীন রত্নাগর ঃ *এন্‌কাউন্টার*

৪। অলচিন এন্ড এফ. আর. অলচিন্ ঃ *দ্য অরিজিন অফ্ দ্য ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন্ (১৯৯৭)*

৫। ওয়াল্টার এ. ফেয়ার সার্ভিসেস (জুনিয়র) ঃ *দ্য রুটস্ অফ্ এনসেন্ট ইন্ডিয়া* (১৯৭১)

৬। বি. কে. থাপার ঃ *রিসেন্ট আর্কিওলজিক্যাল ডিসকভারীস্ ইন্ ইন্ডিয়া।*

# একক ২খ ❑ বৈদিক যুগ

*গঠন*

২খ.০ উদ্দেশ্য

২খ.১ বৈদিক যুগের সমাজ

২খ.১.১ গোষ্ঠীবদ্ধতা

২খ.১.২ সমাজে শ্রেণীবিভাজন

২খ.১.৩ বিবাহ ঃ এক প্রতিষ্ঠান ও নারীর ভূমিকা

২খ.১.৪ সমাজে নারীর স্থান ও তার অবনমন

২খ.২ বর্ণবৈষম্য

২খ.৩ খাদ্যাভ্যাস

২খ.৪ বৈদিক যুগের অর্থনীতি

২খ.৪.১ কৃষির প্রসার

২খ.৪.২ পশুপালন

২খ.৪.৩ উৎপাদন প্রযুক্তি ও শস্যসম্ভার

২খ.৫ শিল্প প্রয়াস

২খ.৬ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি

২খ.৬.১ বাণিজ্যপথ

২খ.৬.২ বিনিময় ও মুদ্রার ব্যবহার

২খ.৭ সম্পদের মালিকানা

২খ.৮ বৈদিক যুগের রাজনৈতিক সংগঠন

২খ.৮.১ গণরাষ্ট্র

২খ.৮.২ সভা ও সমিতি

২খ.৮.৩ রাজশক্তির প্রাধান্য

২খ.৯ অনুশীলনী

২খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী

## ২খ.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন

- বৈদিক যুগের সমাজ, বিবাহ-প্রথা, বর্ণবৈষম্য কেমন ছিল
- বৈদিক যুগের অর্থনীতি, খাদ্যাভ্যাস, কৃষি, পশুপালন, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি
- বৈদিক যুগের বাণিজ্য, সম্পদের মালিকানা এবং রাজনৈতিক সংগঠন

## ২খ.১ বৈদিক যুগের সমাজ

ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা বৈদিক সাহিত্য। এই বৈদিক সাহিত্য শুধু ভারতীয় নয় সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীরও সবচেয়ে পুরাতন সাহিত্যসৃষ্টি। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত ছাড়াও ইরানীয়, গ্রীক, লাতিন, জার্মানিক, স্লাভিক ভাষায় বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা তথা আর্যভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর এক সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উপস্থিতির কথা জানা যায়। বৈদিক সাহিত্য এই আর্যভাষী জনগোষ্ঠীসৃষ্ট রচনা। বিগত কয়েক শতাব্দীর ভাষাগত গবেষণার ফলে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও আদি বাসস্থান সংক্রান্ত নানা বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এই বিতর্কের অবসান আজও ঘটেনি। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকালে এই আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই।

*ঋক্, সাম, যজুঃ* ও *অথর্ব,* এই চারটি সংহিতা ও তৎসহ এই রচনার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলি নিয়েই বৈদিক সাহিত্য গঠিত। এই সাহিত্য-রচনাগুলি যে সমাজজীবনের ছবি তুলে ধরেছে তাকে বৈদিক যুগের সমাজ বলা হয়। কালসীমার ধারণা করতে গেলে ভাষাগত দিক থেকে বিচার করে আধুনিক গবেষকদের মতামত এই যে, বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদ আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সম্পাদিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য সংহিতা ও সমস্ত *ব্রাহ্মণ, আরণ্যক* ও *উপনিষদ* সাহিত্য-সম্বলিত উত্তর-বৈদিক বা পরবর্তী-বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল এর পরে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে পড়ে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর যে শাখা ভারতে আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, বা তারও কিছু পূর্বে, আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ পৌঁছেছিল তারা ইরানের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করেছিল। সম্ভবত ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের পূর্বে তারা কিছুকাল ইরানে বসতি স্থাপন করেছিল। গবেষকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগ থেকেই বহু ক্ষুদ্র উপজাতি ভারতে প্রবেশ করে। এ ছাড়া, অন্য একদল ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী খাইবার গিরিপথ ধরে কাবুল উপত্যকায় উপস্থিত হয়। অন্য আর একটি দলও কিছুকাল পরে হিন্দুকুশ পর্বত দিয়ে বালখ্ এলাকায় প্রবেশ করে। বৈদিক আর্যরা এর যে-কোন একটির বা সম্মিলিত শাখার উত্তরসূরি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদে যে সমাজের বিবরণ পাওয়া যা তা মূলত যাযাবর পশুচারণ-ভিত্তিক জীবনের ছবি। ইন্দো-ইউরোপীয়দের বিচরণশীলতার চিত্রটি উপরের আলোচনাতেও প্রমাণিত।

এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ঘোড়ার ব্যবহার জানত এবং সম্ভবত, সর্বপ্রথম বন্য ঘোড়াকে পালনের আওতায় নিয়ে আসে। এ প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম সম্ভবপর হয়েছিল পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় এবং এর সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব সহস্রাব্দের কিছু পূর্বে। এই কারণে এবং ভাষাগত দিক থেকে বিচার করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি সম্পর্কে গবেষকরা নানা তথ্য ও তত্ত্ব পেশ করেছেন। গবেষকদের মতানুযায়ী ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসভূমি হাঙ্গেরীর নিচু সমতল ভূমিতেই হোক অথবা পূর্বতন সেভিয়েত রাশিয়ার দক্ষিণাংশের তৃণভূমি অঞ্চলেই হোক, পশুচারণই ছিল এদের প্রধান জীবিকা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের পরও তা বর্তমান ছিল। এঁরা যাযাবর এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং ইরানীয় পার্বত্য অঞ্চল ধরে পূর্বে অগ্রসর হয়ে একসময়ে, আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, তাঁরা আফগানিস্তানে ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে কিছুকাল বসতি স্থাপন করেন। ঋগ্বেদ-এর বর্ণনায় এই চিত্রটি পাওয়া যায়।

*ঋগ্বেদ*-এ যে ভৌগোলিক বিবরণ রয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, এই আর্যভাষা ব্যবহারকারী যাযাবর পশুপালক জনগোষ্ঠীগুলি ক্রমু অর্থাৎ আধুনিক কুররম, কুভা অর্থাৎ আধুনিক কাবুল, রসা ও অনিতভা নামক সিন্ধুনদের পশ্চিম দিকের উপনদী এবং মেহৎনু নদীগুলির অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থান করেছিল। এই নদীগুলি প্রধানত আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। এর পরবর্তীকালে বৈদিক আর্যগণ আরও পূর্বাভিমুখী হয়েছিলেন তার প্রমাণ *ঋগ্বেদ*-এ মেলে। *ঋগ্বেদ*-এর অন্তর্গত সবথেকে পরবর্তীকালের রচনা দশম মণ্ডলের নদীসূক্তে যে নদীগুলির বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে আর্যদের এই ক্রমশ পূর্বে অগ্রসর হওয়ার চিত্রটি ফুটে ওঠে। পাঞ্জাবের পঞ্চনদের মধ্যে শতদ্রু বা সাটলেজ, পরুষ্নী বা ইরাবতী অর্থাৎ রাভী, অসিক্লী অর্থাৎ চন্দ্রভাগা বা চেনাব, আর্জিকিয়া বা বিপাশা ও সুষোমা বা সিন্ধুর কথাও বলা হয়েছে। বিতস্তা বা ঝিলমেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এবং একই সঙ্গে গঙ্গা ও যমুনার কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ দশম মণ্ডলের রচনাকালে পঞ্চনদ অঞ্চল থেকে বৈদিক আর্যরা গঙ্গার নিকট অবধি অগ্রসর হয়েছিলেন বা গঙ্গার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

তবে আফগানিস্তানের নদীর উপত্যকা থেকে প্রথমে বৈদিক আর্যরা সিন্ধু অঞ্চল ও পূর্বে পাঞ্জাবের পঞ্চনদ ও সরস্বতীর পূর্বতন অববাহিকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে তাঁরা আরো পূর্বে অগ্রসর হয়ে যমুনা ও গঙ্গার সঙ্গে পরিচিত হন। এই পঞ্চনদ ও সরস্বতী অববাহিকা অঞ্চলে বসতিকালেই স্থায়ী বসবাস ও কৃষির সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। *ঋগ্বেদ*-এ সপ্তসিন্ধুর অর্থাৎ সিন্ধু, সরস্বতী ও পাঞ্জাবের পঞ্চনদ অঞ্চলকে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অঞ্চলে প্রথম বৈদিক আর্যগণ দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেন ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক জীবন বিকশিত হয়। যে সময়ে তাঁরা এই পাঞ্জাব ও নিম্নসিন্ধু অঞ্চলে এলেন সে সময় সেই স্থানে প্রাক্-বৈদিক হরপ্পীয়দের উত্তরসূরি কিছু সংস্কৃতির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। এ ছাড়া, অন্যান্য তাম্র প্রস্তর সংস্কৃতিরও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এই স্থানে এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। বৈদিক আর্যরা এই সংস্কৃতিগুলির সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রথমত, মহেঞ্জোদারোয় হরপ্পীয় সংস্কৃতির অন্তিম পর্বে আর্যদের আগমন ঘটে থাকতে পারে, এমন অভিমত কোনও কোনও ঐতিহাসিক পোষণ করেন। এ ছাড়া, সামাজিক জীবনের ক্রমবিবর্তনের ধারায় বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যান্য অনার্য সংস্কৃতির আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানরূপে আফগানিস্তানে প্রাপ্ত গান্ধার সমাধি সংস্কৃতি রাজস্থান, হরিয়ানা ও পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশে প্রাপ্ত গৈরিক মৃৎপাত্র ও এর সামান্য পরবর্তী কালের চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতিগুলির উপস্থিতি

ও পরিচিতি বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক এই দুই উপাদানের ভিত্তিতে বলা যায় যে পশ্চিমে সিন্ধুনদ অঞ্চল থেকে পূর্বের শতদ্রুর অববাহিকা অঞ্চল ও উত্তর আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণ-রাজস্থানের উত্তরাংশ অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে মানব সমাজে পরিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর সূচিত হয়। সামাজিক বিবর্তনের যে প্রাথমিক ধারা হরপ্পীয় সভ্যতার বিকাশে লক্ষণীয় হয়েছিল এই নতুন ধারাটি তার থেকে বহুলাংশে পৃথক হলেও হরপ্পীয় সংস্কৃতির সার্বিক প্রভাবে এই নূতন সভ্যতার বিকাশে উপলব্ধ।

## ২খ.১.১ গোষ্ঠীবদ্ধতা

মধ্যএশিয়া তথা ইরান থেকে আগত যাযাবর পশুপালক এই আর্যভাষী মানুষেরা গবাদি পশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে দীর্ঘ সময় ধরে একস্থান থেকে আরেক স্থানে নিরন্তর যাতায়াত করতেন। এ সময় বৈদিক আর্যদের সামাজিক পরিচয় পশুধন ও পশুধনের যৌথ অধিকারী এক-একটি গোষ্ঠীর দ্বারা নির্মিত ছিল। ধীরে ধীরে সমাজ স্থিতিশীলতার দিকে অগ্রসর হলে এই গোষ্ঠীগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে উপজাতীয় স্তরে। *ঋগ্বেদ*-এ কয়েকটি উপজাতির প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরু, যদু, দ্রুহ্য, তুর্বশ, অনু, ভরত ইত্যাদি উপজাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্রও পাওয়া যায়। আর্য উপজাতিগুলির মধ্যে কখনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কখনো মৈত্রীবন্ধনের উল্লেখও রয়েছে। আর্থ-সামাজিক ক্রমবিকাশের ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলি ক্রমশ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বৃহত্তর জনজাতিতে পরিণত হয়। রোমিলা থাপার মনে করেন যে এই ধরনের সামাজিক প্রসারের একটি নিদর্শন পাঞ্চাল উপজাতি যা সম্ভবত পাঁচটি গোষ্ঠী-সংবদ্ধ একটি উপজাতীয় সংগঠন।

বৈদিক সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল সবথেকে ক্ষুদ্র সামাজিক একক, পরিবার। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে পরিবারের অপরিসীম গুরুত্ব ছিল। এই পরিবারের অভিভাবক ছিলেন পিতা বা কর্তা। এক-একটি পরিবারের আয়তন ছিল বৃহৎ কারণ দুই-তিন পুরুষ ধরে পরিবারের সদস্যরা যৌথভাবে একই সাথে বসবাস করতেন। এই পরিবারের উদ্ভব কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কৃষির সূচনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এইরূপ একই বৃহদায়তন যৌথ পরিবারের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে গঠিত হয়েছিল এক-একটি কুল। এই কুলের শীর্ষে অধিষ্ঠিত ছিলেন কুলপতি। পরিবারের অভিভাবকরূপে গৃহপতি বা পিতা, সন্তান ও স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করতেন। সন্তানের সঙ্গে পিতার সুমধুর সম্পর্কের কথা *ঋগ্বেদ*-এ জানা যায়। তবে এও দেখা যায় যে পিতা একশোটি ভেড়া মারার অপরাধে পুত্রকে অন্ধ করে দিয়েছেন। *ঋগ্বেদ*-এ রচনার গোড়ার দিকে পরিবার ও কুলগুলি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্মিলিত ছিল এবং গোষ্ঠীগুলি কৌম সংগঠনে রূপায়িত ছিল।

*ঋগ্বেদ*-এ সাধারণ জীবনের বর্ণময় চিত্র পাওয়া যায়। এই রচনাতে বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত। একদিকে যেমন এতে নিসর্গ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বোধ লক্ষ্য করা যায়, অপরদিকে, দৈনন্দিন জীবনের ছবিতে জুয়াড়ির খেদ ও আত্মগ্লানি, যুদ্ধজয়ের আনন্দ, গাভীচুরির বর্ণনা, নববধূর প্রতি আশীর্বাদ ইত্যাদির উল্লেখ থেকে সজীব সমাজের চরিত্র অনুধাবন করা যায়। উপমাগুলি থেকে যে সমাজের কথা জানা যায় তা কঠোর নীতিনিষ্ঠ জীবনের থেকেও একটি স্বতঃস্ফূর্ত, সজীব জীবনীমুখী অস্তিত্বের কথাই বলে।

ঋগ্বৈদিক যুগের গোড়ায় ভারতে সদ্য আগত বৈদিক আর্যদের অন্যান্য গোষ্ঠী এবং এমনকী আর্যদের নিজেদের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরন্তর লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এরই সাথে চলেছিল নিরন্তর নূতন স্থানে পরিক্রমা ও ধন

আহরণের প্রচেষ্টা। ধন বলতে বৈদিক আর্যদের প্রধান সম্ভবল ছিল গবাদি পশু ও ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন ঘোড়া। লুণ্ঠন, যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব জীবনের অঙ্গ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাগার্য কৃষিচারী উপজাতিগুলির প্রভাবে বৈদিক আর্যরা ক্রমশ পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্মে যুক্ত হয়ে পড়ে। এর পর ক্রমশ কৃষি, অর্থনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত অর্থনীতি, শ্রেণী ও বর্ণ বিভেদের পটভূমি রচনা করেছিল। পশুপালন অর্থনীতিতে 'ধন'-এর ধারণা কৃষি-অর্থনীতিতে 'সম্পদ'-এ পরিণত হয় ও সম্পদকে কেন্দ্র করে পরিবার কুল তথা গোষ্ঠীর পরিচয় ও অধিকার গুরুত্ব লাভ করে। প্রথমে উপজাতিগুলি গণতান্ত্রিক সমবায়িক হলেও ঋগ্বেদের যুগেই ক্রমশ সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল, 'বিশ' বা সাধারণ মানুষ ও 'রাজন্য'বর্গের মধ্যে। ধনী ও নির্ধন, সমাজে ক্ষতাশীল ও সাধারণের মধ্যে বিভেদ—শুধু সম্পদ নয়, জাতি ও পরিস্থিতিগত দিক থেকেও ঘটেছিল। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত হয়েছে 'দাস'-এর কথা। কোন কোন বর্ণনায় দাসদের কৃষ্ণ-গাত্রবর্ণের বর্ণনা রয়েছে[১২] যা থেকে দাসদের কিছু অংশ অনার্য উপজাতির মানুষ বলে মনে করা যেতে পারে। যুদ্ধে বিজিত বা পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে আর্য অথবা অনার্য মানুষও দাসে পরিণত হয়ে থাকতে পারেন। অন্যদিকে অবশ্য দাসগণ 'পূর' বা শহরের অধিবাসী এবং ধনশালী বলেও বর্ণিত। লুডভিগ, জিমার ও মেয়ার এর মতে *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত দাস বলতে অনার্য শত্রুদের কথা বলা হয়েছে। হিলেব্রান্ড্ট্ এর মতে 'দস্যু' বা 'আসুর' বলতেও ঋগ্বেদে অনার্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এই অনার্যদের প্রতি বৈদিক আর্যদের ঘৃণার মনোভাবটি বারবার ব্যক্ত হয়েছে। এই আচরণকে সমর্থন করার জন্য স্বভাবতই দৈবী স্বীকৃতি প্রমাণ করার প্রয়াস রয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এ বলা হয়েছে—ইন্দ্রই দাসদের সমাজে নিচু স্থান দিয়েছেন।

### ২খ.১.২ সমাজে শ্রেণীবিভাজন

আর্য ও অনার্য উপজাতির মধ্যে বিভেদ ছাড়াও ধনী-নির্ধনের বিভেদের কথা আরো জানা যায় দারিদ্র্যের বর্ণনায়। দারিদ্র্য নিবারণ করবার জন্য ভক্ত দেবতার দ্বারস্থ হচ্ছে এমনও দেখা যায়। বামদেব অভাবে পড়ে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছিলেন। গরিব ছুতোর পরিশ্রমে ও ক্লান্তিতে হাই তুলছে এ বর্ণনাও পাওয়া যায়। জুয়াড়ি সর্বস্বান্ত হয়ে অনুতাপ করছে তাও জানা যায়। চুরির নজিরও বহু পাওয়া যায় *ঋগ্বেদ*-এ। সুতরাং অভাব ও অভাবজনিত অপরাধ দুইই বর্তমান ছিল। অন্যদিকে ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞাদিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবেই স্বচ্ছল ছিল বলে জানা যায়। ধনী ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠীপতির বর্ণনাও রয়েছে। এমনকী ধনার্থী বণিকের কথাও বলা হয়েছে যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ধনলাভের জন্য সমুদ্রে গমন করবেন বলে সমুদ্রকে স্তুতি করেন বলে জানা যায়।

একদিকে এই শ্রেণীবিভাজন ঘটেছিল, অন্যদিকে *ঋগ্বেদ*-এরই পুরুষ সূক্তে বর্ণভেদের প্রথম স্পষ্ট বিন্যাস দেখা যায়। এই সূক্তে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণেরা পুরুষ অথবা ব্রহ্মের মুখ থেকে, রাজন্য বাহু থেকে, বৈশ্য উরু থেকে এবং শূদ্র পা থেকে সৃষ্ট হয়েছিল। *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলের রচনাকাল পরবর্তী সময়ের বলে ধরা হয়। তাই এই বর্ণনায়. যে পরিচ্ছন্ন বর্ণ-বিভাজনের ইঙ্গিত রয়েছে তা *ঋগ্বেদ*-এর গোড়ার যুগে ততটা প্রকট ছিল না বলে মনে করা হয়।

*ঋগ্বেদ*-এ দেখা যাচ্ছে এক কবির পিতা, উপার্জনক্ষম, অন্যের উপর নির্ভরশীল, তাঁর মাতা ধান পেষাই করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্ভবত গোড়ায় জীবিকা বর্ণভিত্তিক এবং বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠেনি, তবে 'দাস'-

এর উল্লেখ *ঋগ্বেদ*-এ বারংবার এসেছে এবং সম্ভবত গাত্রবর্ণের জন্য বর্ণবিভেদের প্রথম সূচনা, বিশেষত প্রথম তিনটি বর্ণের বিন্যাস হয়েছিল। রোমিলা থাপারের মতে বর্ণ-বিভাজন বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট একটি তাত্ত্বিক কাঠামো—সে যুগে প্রচলিত সমস্ত জীবিকাকেই এক আকৃতির মধ্যে সাজাতে চেয়েছিলেন। এরই মধ্যে যে যে বিভিন্ন ধরনের জীবিকার উদ্ভব স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল সেগুলিও মিশ্র-বর্ণরূপে সাজিয়ে পরিবেশিত হল।

এই বিভাজন ধীরে ধীরে ঘটে এবং পরবর্তী বৈদিক যুগে শ্রেণীবৈষম্য ও বর্ণবৈষম্য দুইই পরিণতি লাভ করে। দরিদ্র শ্রেণী, অনার্য এবং মিশ্র জাতির মানুষেরা চতুর্থ বর্ণভুক্ত হন। এই শূদ্রদের সঙ্গে সম্ভবত ঋগ্বেদের বর্ণিত 'দাস'-এরাও যুক্ত হন।

## ২খ.১.৩ বিবাহ ঃ একটি প্রতিষ্ঠান ও নারীর ভূমিকা

পরিবার ও কুলের সংগঠনকে দৃঢ় করতে বিবাহের প্রতিষ্ঠানটি বৈদিক সমাজে গুরুত্ব পেয়েছে এবং বিবাহের উপযোগিতা সম্পর্কে যথেষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তবে অবিবাহিতা নারীর উল্লেখও পাওয়া যা যাঁদের 'অমার্জ' ও 'জরযন্তি' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বিবাহিত দম্পতি গৃহের কর্তৃত্ব ভোগ করে নিতেন। নারী-পুরুষের বৈবাহিক চুক্তির আভাস সীতা-সাবিত্রী উপাখ্যানে পাওয়া যায়—যিনি সোমকে কতকগুলি চুক্তির পরিবর্তে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন। উর্বশীও পুরুরাজার সাথে চুক্তিবদ্ধ বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিবাহে কন্যাপণের কথা পাওয়া যায়, যেমন ঊষার ক্ষেত্রে। অন্যদিকে উপমায় দেখা যায়—ইন্দ্র আর অগ্নি ভক্তকে ধন দেন। আবাঞ্ছিত জামাতা, প্রচুর ধন দিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের প্রীতিভাজন হতে সচেষ্ট হয়। নারীহরণের উল্লেখও পাওয়া যায় *ঋগ্বেদ*-এ।

অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বা শিশু-বিবাহের কথা *ঋগ্বেদ*-এ পাওয়া যায় না। নারীর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তবেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতেন এবং কন্যা ও বরের পারস্পরিক গুণাগুণ বিবাহের ক্ষেত্রে বিচার্য ছিল। নারী নিজেই জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারতেন। *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলে বিবাহ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তা থেকে অনুমেয় যে বিবাহে বর ও কন্যার পরস্পরের ঈপ্সিত প্রীতিপূর্ণ সংযোগ ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। নারী-পুরুষের বিবাহ কাম্য ছিল, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল না। ঋগ্বেদের যুগে প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহের প্রচলিত ধারা এবং অবিবাহিত থাকার রীতি নারীর শিক্ষার সুযোগের ইঙ্গিত বহন করে। বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা ইত্যাদি ঋষিকার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা জ্ঞানে ঋষিপদ অর্জন করেছিলেন। বিশ্ববারা শুধু শ্লোক রচনাই করেননি—ঋত্বিকরূপে যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার অধিকারীও ছিলেন। শিক্ষিতা নারীর মধ্যে প্রকারভেদ ছিল। ছাত্রীরা দু-প্রকারের ছিলেন ঃ ব্রহ্মবাদিনী নারীরা শাস্ত্র ও দর্শন চর্চায় রত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই শ্লোক রচনা করেছেন। ব্রহ্মবাদিনীদের অনেকেই শাস্ত্র অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত ছিলেন এবং ঋগ্বেদে আচার্যা'র উল্লেখও রয়েছে। অন্যদিকে ছিলেন সদ্যোদ্বাহ নারী যাঁরা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত অধ্যয়নে রত থাকতেন। এ যুগের নারী জনসভায় অংশগ্রহণ করতেন। বিশেষ করে 'বিদথ' নামক সভায় পরিবারের প্রাপ্য রসদের অংশটুকু তিনি সংগ্রহ করতেন। এ ছাড়াও, ঋগ্বেদের নারীকে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। বীরনারী বিশ্পলা যুদ্ধে তাঁর পা হারিয়েছিলেন। মুদ্গলানী ইন্দ্রের তীরের ন্যায় তীব্র গতিতে রথ চালনা করে যুদ্ধে জয় ও ধন আহরণ করেন।

বিবাহিতা নারী গৃহে সম্মানিত ছিলেন। বিবাহিতা স্ত্রী কল্যাণী ও পবিত্র 'শিবতমা'। তিনি গৃহের সম্রাজ্ঞী। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর সতী হওয়ার কোন নির্দেশ বৈদিক সাহিত্যে নেই। বিধবা নারীর কুল বা জ্ঞাতির মধ্যেই

পুনর্বিবাহ হওয়ার রীতি ছিল। *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলে দেখা যাচ্ছে বিধবা নারী যখন মৃত স্বামীর পাশে শুয়ে আছেন তখন দেবর এসে তাঁকে আহ্বান করবেন মৃতলোক থেকে জীবলোকে। সুতরাং সহমরণ এমনকী কঠোর বৈধব্যযাপন কোনটাই ঋগ্বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল না। পরবর্তী কালে অথর্ববেদ-এর জীবিত নারীকে মৃতের বধূ হতে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে এবং একটি নারী পতিলোকে যাচ্ছে প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে—একথাও বলা হয়েছে। সুতরাং বৈদিক সমাজে নয় সম্ভবত তারও পূর্বে বর্তমান কোন সমাজের এই রীতি ছিল, বৈদিক সাহিত্যে তারই ছবি রয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেও বিধবা নারীর জীবিতাবস্থা বর্ণিত হয়েছে। *অথর্ববেদ*-য়েই রয়েছে নারীর দ্বিতীয় বিবাহের কথা। আবার এ কথাও রয়েছে যে, কোন নারীর দশটি পতি থাকলেও ব্রাহ্মণ-পতিই অগ্রাধিকার পাবেন কারণ সে ক্ষেত্রে রাজন্য বা বৈশ্য পতিদের কোন অধিকার থাকে না। এ থেকে নারীর বহুবিবাহ ও সমাজে ব্রাহ্মণ বর্ণের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারের কথা জানা যায়। পুরুষের বহুবিবাহের কথাও বৈদিক সাহিত্যে গোড়া থেকেই পাওয়া যায়। নারীর সপত্নী-যন্ত্রণার কথাও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা-তে কোন নারীকে প্রার্থনা করতে দেখা যায় তিনি যেন ইন্দ্রাণীর মতো অবিধবা হন। তবে নারীর বহুবিবাহ সম্ভবত ক্রমশ সমাজে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। সে সম্ভাবনা *অথর্ববেদ*-য়েই দেখা যায়—যখন দ্বিতীয় পুরুষকে লাভ করে তখন সামাজিক এবং শাস্ত্রীয় মতে পঞ্চৌদন অজ দান করলে তাতে কোন অন্যায় হয় না। এই দানের গ্রহীতা স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ এবং ধীরে ধীরে সমাজে নারীর বহুবিবাহ নিয়ম-বহির্ভূত দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরা হয়েছে *অথর্ববেদ*-এ।

### ২খ.১.৪ সমাজে নারীর স্থান ও তার অবনমন

*ঋগ্বেদ*-এ নারী সমাজে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের নারী সে স্থান থেকে বিচ্যুত। সুকুমারী ভট্টাচার্য পরবর্তী বৈদিক সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন যা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এই সামাজিক জটিলতার শিকার হলেন নারী ও শূদ বর্ণের মানুষেরা। সম্পদের উপর অধিকার জ্ঞাপনের একটি মাধ্যম হল শ্রমিকের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তাই বর্ণ-ব্যবস্থা প্রকট হয়েছে। শ্রমজীবি বৈশ্য ও বিশেষত শূদ্রের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলন বৃদ্ধি পেলে পারিবারিক পরিধি ক্রমশ সুসংগঠিত হতে থাকল। প্রজননের মাধ্যমরূপে নারীর ভূমিকা চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি যখন প্রধান হয়ে উঠল, তখন নারীকে পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার প্রয়াস বৃদ্ধি পেল। এ ছাড়া কৃষির প্রসারে বলদ ও লাঙলের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় শারীরিক কারণে নারী কৃষি উৎপাদন থেকেও অপসারিত হলেন। বস্ত্রবয়ন ছাড়া অন্যান্য উৎপাদনেও নারীর ভূমিকা ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, পরবর্তী বৈদিক যুগে বহু অনার্য নারী আর্য-পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আর্য সমাজে প্রবেশ করলেন। কিন্তু এই নারীদের আর্য সমাজে যথার্থ স্বীকৃতি ছিল না। এর জন্য সামগ্রিকভাবে সমস্ত নারীর অবমূল্যায়ন ঘটে গেল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর গতিবিধি, বৈবাহিক ও ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল পরিবার ও প্রজননের স্বার্থে। নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ হল *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য়। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*-এ কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহের প্রথাটি বজায় থাকল। *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-এ মনুর দশটি ও চন্দ্রের সাতাশটি স্ত্রীর উল্লেখ রয়েছে। রাজার বহুপত্নীত্বের কথাও বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এবং এঁদের নানা নামে অভিহিত

করা হয়েছে, যথা—মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তি ইত্যাদি। নারী এযুগে কুলনারীতে রূপান্তরিত এবং গৃহের বাইরে তাঁর ভূমিকা নগণ্য হয়ে পড়েছিল। বেদ অধ্যয়নের অধিকার তিনি হারিয়েছেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী ও শাশ্বতীর মতো বিদুষী নারীর কথা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া গেলেও তা ব্যতিক্রম মাত্র। শিক্ষিতা নারীর প্রসঙ্গে *তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এর বক্তব্য যে তাঁরা নারী হয়েও পুরুষ। এই মন্তব্যে নারীর যথার্থ ভূমিকা সম্বন্ধে বৈদিক সমাজের মনোভাব সুস্পষ্ট। কন্যাসন্তান যে জন্মকাল থেকেই পুত্রসন্তানের থেকে আকৃষ্ট বলে গণ্য তা *ঋগ্বেদ*-এও লক্ষ্য করা যায়। *অথর্ববেদ*-এ এই মনোভাব আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। নানা যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে এই সংহিতায় যার মাধ্যমে কন্যাসন্তানের পরিবর্তে পুত্রের জন্ম হবে বলে মনে করা হয়েছে। অবশ্য *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ একটি যজ্ঞের উল্লেখ রয়েছে যা অনুষ্ঠিত হত বিদূষী কন্যাসন্তানের কামনা করে। কিন্তু এটি সামগ্রিক চিত্র নয়। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ কন্যাকে অভিশাপ বলে মনে করা হয়েছে। সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে মাটিতে ফেলে রেখে পুত্রকে কোলে তুলে নেওয়ার রীতির বিবরণ পাওয়া যাবে *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-য়। এই চিত্রই নারীর প্রতি পরবর্তী বৈদিকে সমাজের মনোভাব সঠিক নির্দেশ করে। এ যুগে নারীকে পুরুষের ভোগ্যরূপেই দেখা হয়েছে। নারীকে বলপূর্বক দমন করার নির্দেশ রয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণ ও *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ। সর্বগুণান্বিতা শ্রেষ্ঠা নারীও অধমতম পুরুষের থেকে হীন বলে গণ্য ছিলেন।

## ২খ.২ বর্ণবৈষম্য

এই বৈষম্য-বৃদ্ধির প্রতিফলনস্বরূপ দেখা যায় যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে শূদ্রকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সৃষ্ট নিয়মাবলী; শূদ্র অপরের দ্বারা পীড়িত হওয়াই স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। শূদ্রকে সহজেই জমি থেকে উৎখাত করা যায় এবং শূদ্রকে হত্যাও খুব ভয়ংকর অপরাধরূপে গণ্য হত না। যাগযজ্ঞাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমাজ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে পড়ায় ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেলে বর্ণবৈষম্যও বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি সমাজে শ্রেণী-বৈষম্যের পটভূমি রচনা করে।

*যজুর্বেদ*-এ বর্ণ-বিভেদের পূর্ণ রূপ বিকশিত। এছাড়া অনার্য-উপজাতিগুলির সঙ্গে বৈদিক আর্যদের বৈবাহিক সংমিশ্রণ বৃদ্ধির ফলে প্রধান চারটি বর্ণ ছাড়াও নূতন বর্ণের সৃষ্টি হয়। নতুন নতুন কর্মভিত্তিক শ্রেণীগুলিও প্রায়শই বর্ণে রূপান্তরিত হয়। *বাজসনেয়ী সংহিতা*-য় কারিগরী শিল্প ও শিল্পীর তালিকাটি থেকে এর পরিচয় পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ রয়েছে যে শিল্পকর্মীদের যাঁরা বর্ণজাতিতে পরিণত হয়েছেন—কৌলাল বা কুমোর, কামার, রজক, চর্মকার, শৈলুষ বা অভিনেতা, গোপালক বা পশুপালক, সূত বা নট, ইত্যাদি। এ থেকে সমাজে বিবিধ জীবিকার রূপটি পাওয়া যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণবৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে বৈশ্য ও বিশেষত শূদ্র বর্ণের মানুষের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের পারস্পরিক তারতম্য সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সমাজের শীর্ষে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের যুগপৎ অধিষ্ঠানে যে আরো দৃঢ়সংবদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ বলা হয়েছে, "ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করলেন, তিনি সমস্ত মানব সমাজের প্রভু, তিনি সর্বসাধারণকে ভোগ করবেন এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করবেন। সুতরাং বিশ্ অথবা বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের

মানুষরা রাজন্যের আনন্দবর্ধন করবেন এ কথা ধরেই নেওয়া হয়েছে। *অথর্ববেদ*-য়েও দেখা যায়—রাজা "বিশমত্তা", অর্থাৎ প্রজাগণকে তিনি ভক্ষণ করতে সক্ষম। বিশে'র অন্তর্গত বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ একদিকে এবং রাজন্যবর্গ আরেকদিকে সমাজকে দ্বিস্তরে বিভক্ত করে। ব্রাহ্মণরা এই স্তরীভূত সমাজের আধ্যাত্মিক পরিচালনার ভারই শুধু নেননি, রাজন্যবর্গের ক্ষমতা প্রসারে তত্ত্বের উপস্থাপনা করে রাজনৈতিক গুরুত্বও লাভ করেছিলেন। পরবর্তী বৈদিক যুগের জীবনে পূজা, যাগযজ্ঞের গুরুত্ব ও বাহুল্য বেড়েছিল। এই অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ বর্ণের সাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়া এ সময়ে রাষ্ট্র ও রাজশক্তির উত্থান এক স্তরীভূত সমাজের সৃষ্টি করে যেখানে, একদিকে ক্ষমতাশীল রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত এবং অপরদিকে বিশ্ বা বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের মধ্যের দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

## ২খ.৩ খাদ্যাভ্যাস

সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাসের চিত্রও বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান। সব্জী, ফল, দুগ্ধ, যবচূর্ণের পিণ্ড, দুগ্ধজাত ঘি বা দধি এবং মাংস ঋগ্বেদের যুগেও আর্যদের খাদ্যতালিকার অন্তর্গত ছিল। এছাড়া সোমরস অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হত। সাধারণত উৎসবেই সোমরস পান করা হত এবং সুরা জাতীয় পানীয়র নিত্য সেবনও প্রচলিত ছিল। দৈনন্দিন জীবনে প্রমোদের অনুষঙ্গ ছিল পাশা খেলা, জুয়া খেলা, রথচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি। নৃত্যগীতাদিও অনুষ্ঠিত হত। অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে সভাগৃহের উল্লেখ করা হয়েছে বারবার। ঋগ্বেদের যুগে নারী-পুরুষের বেশভূষারও বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁরা নিম্নাঙ্গে নীবি ও ঊর্ধ্বাঙ্গে বাস পরিধান করতেন। এর উপর অনেকে ঊর্ধ্বাঙ্গে অধিবাসও পরতেন। পোশাকের ক্ষেত্রে বহুলাংশে পশমের ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। তবে *ঋগ্বেদ*-এ কৌষেয় (রেশম) বস্ত্রের কথাও বলা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষির প্রসারের ফলে খাদ্যের তালিকা দীর্ঘ হয়। গোধূম ও ধান্য নতুন শস্যরূপে সংযোজিত হল। ফল ও সব্জীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্যেরও বৃদ্ধি হয়। মাংসভক্ষণ প্রচলিত ছিল, তবে গোমাংস ভক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নির্দেশ দেখা যায়। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও বাজসনেয়ী সংহিতা*-য় দেখা যায় গোহননকারী বা গোঘাতককে গোহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। গোভক্ষণ নিন্দিত হয়েছে *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ এবং গাভীকে 'অঘ্না' অর্থাৎ অবধ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে গোভক্ষণ পরবর্তী বৈদিক সমাজে প্রচলিত ছিল ও সোমযাগে বন্ধ্যা গাভী বলি দেওয়ার রীতি ছিল।

## ২খ.৪ বৈদিক যুগের অর্থনীতি

*ঋগ্বেদ*-এর বিবরণ থেকে অর্থনৈতিক জীবন ও বৃত্তির যে কথা জানা যায় তা প্রধানত পশুপালন-নির্ভর। ঋগ্বৈদিক আর্যদের যাযাবর জীবনযাপন ও কৌমগোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের কথা বলা হয়েছে। সাহিত্যে দেখা যায় এই গোষ্ঠীগুলির স্বীকৃত সম্পদ ছিল পালিত পশু, অর্থাৎ প্রধানত অশ্ব, গাভী ও বলদ ইত্যাদি। *ঋগ্বেদ*-এ দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত প্রায় অধিকাংশ প্রার্থনায় দেবতাদের কাছে এই পশুধন কামনা করা হয়েছে। গোমাতাকে সুরভীরূপে কল্পনা পশুপালন অর্থনীতিরই পরিচায়ক।

পশুচারণ ও পশুনির্ভর অর্থনীতির গুরুত্ব *ঋগ্বেদ*-এর শ্লোকে ফুটে ওঠে—"হে সোম! তুমি সুবর্ণ ও ধন,

জন বিতরণ করতে করতে ক্ষরিত হও। তুমি গোধন ও খাদ্যদ্রব আনয়ন কর"। *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলে গোমাতাকে খাদ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। গোমাতাকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে পরবর্তীকালে *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ। গোসম্পদের গুরুত্ব গোষ্ঠী সংগঠনের নামকরণ থেকেই বোঝা যায়। ঋগ্বেদিক যুগের জীবনযাত্রায় গোসম্পদই মূলধন যা আহরণ করার জন্য লুণ্ঠন ও যুদ্ধ প্রত্যহ জীবনযাত্রার সঙ্গী হয়েছিল।

যা কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় ও জীবনধারণের আধার তাকেই ঋগ্বেদিক আর্যগণ তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের কেন্দ্রবস্তুতে রূপান্তরিত করতেন। পশুসম্পদ বৈদিক ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে পড়েছিল। বৈদিক আর্যরা প্রথমে পূষণ ও পরে রুদ্রকে গোসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দেবতারূপে কল্পনা করেছেন। পুষা বা পূষন্, আদিত্য অথবা সূর্যেরই আদি রূপকল্প; পূষণকে 'অঘৃণি' অর্থাৎ 'জ্বলন্ত' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন দূর্গভূমিতে পথভ্রষ্ট গোসম্পদের পুনরুদ্ধার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দুরূহ কাজে পূষণ্ অর্থাৎ সূর্যের কিরণ পথ আলোকিত করবে। *ঋগ্বেদ*-এর ষষ্ঠ মণ্ডলে পূষণ্-দেবতাকে হারানো গোসম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্যে আবাহন করা হয়েছে। এমনকী, একশ্রেণীর বিশেষ গোপালকের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে যাঁরা পশু পুনরুদ্ধার করার কাজে পারদর্শী ছিলেন। পশুচারণের জন্য বিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন ছিল। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে পূষণের কল্পনা প্রাক্‌বৈদিক পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি রথের পরিবর্তে ছাগবাহন, তাঁর চুল বেণীবদ্ধ, 'করম্ভ' অর্থাৎ যবচূর্ণমিশ্র তাঁর খাদ্য। এতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে উপনীত হওয়ার পথে আর্যরা খুব সম্ভবত মোঙ্গোলিয়ার মধ্যে দিয়ে যখন এসেছিলেন। সেই সময় মোঙ্গোলিয় আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যভ্যাসযুক্ত বিশিষ্ট কোনো দেবতার কল্পনা তাঁরা পথে সংগ্রহ করেছিলেন। "....কালক্রমে তিনি পথিক মানুষ ও বিচরণশীল পশুর পথপ্রদর্শক দেবতার ভূমিকাও গ্রহণ করেন....."।

গোধন ছাড়া অন্য যে পশুটি বৈদিক আর্যদের জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা হল অশ্ব। ভারতীয় উপমহাদেশে অশ্বের প্রচলন সম্ভবত বৈদিক আর্যরাই প্রথম করেছিলেন। ঘোড়ার ব্যবহার বৈদিক সভ্যতাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন বলশালী এই পশুটি তার ব্যবহারকারী মানুষকে দিয়েছিল গতি ও শক্তি যা আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা দুই ক্ষেত্রেই বিপুল সহায়তা করেছে। এ ছাড়া, গোচারণ বা গো-আহরণের কাজেও ঘোড়ার ব্যবহার সুবিধা দিয়েছিল। বৈদিক সভ্যতায় অশ্বের গুরুত্ব আর্যদের অনুষ্ঠিত নানা যাগযজ্ঞে ও মন্ত্রপাঠে প্রতিফলিত হয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ বৈদিক ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুষ্ঠান। রাজনৈতিক বিজয়লাভের প্রতীকী ঘোষণার জন্য এই যজ্ঞে রাজপ্রতিভূরূপে অশ্বের ব্যবহার এই কথাই নির্দেশ করে, অশ্বকে পশুদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বলে মনে করা হয়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এর সফল ব্যবহার আর্যদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। অশ্বের উপস্থিতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে অস্থি পাওয়া গেছে ইরান ও আফগানিস্তানে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশে ও বেলুচিস্তানের পিরাকে এবং গান্ধার সমাধি সংস্কৃতিতে পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকায় এবং গুজরাটের সুরকোটাডাতে অস্থি ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া গেছে যা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের কিছু পরে প্রাপ্ত। হরপ্পীয় সভ্যতার পরবর্তী স্তরেও অশ্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, রূপার ও লোথালে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে অশ্বের নিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি বৈদিক সাহিত্যে গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা যায় এবং চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র-সংস্কৃতির প্রত্নক্ষেত্র হস্তিনাপুর, অত্রঞ্জিখেড়া, ভগবানপুরা ইত্যাদি স্থানে অশ্বের উপস্থিতি বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে এই সংস্কৃতির সম্পর্কের সম্ভাবনা তুলে ধরে।

গাভী ও অশ্ব ছাড়া অন্যান্য যে সব পালিত পসুর প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে তা হল, অজা অর্থাৎ ছাগল, অবি বা ভেড়া, অশ্বেতর বা গাধা ইত্যাদি। হরপ্পীয় পশুপালন অর্থনীতিতেও গাভী ও এই পশুদের বহুল ব্যবহার ছিল। পূর্বের অর্থনীতিতে গোসম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে গোভক্ষণ অশুদ্ধ ছিল না। বরং *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-র একটি অংশে এই ধারণা প্রকাশিত হয়েছে যে বৈশ্যদের মতোই গবাদি পশুও প্রজাপতির দ্বারা সৃষ্ট এবং তাদের ভক্ষণ করা স্বাভাবিক, কারণ খাদ্য হিসাবে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যই তাদের প্রজাপতি সৃষ্টি করেছেন। এই কারণেই তারা সংখ্যায় এত গরিষ্ঠ। এই সংহিতারই অপর অংশে দেখা যাচ্ছে যে নবচন্দ্রিকার দিনে মিত্র এবং বরুণের আবাহনে গাভী বলি দেওয়া হচ্ছে। সোমযজ্ঞেও মিত্র ও বরুণের পূজায় বন্ধ্যা গাভী বলি দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পূর্ববর্তী বৈদিক জীবনযাত্রায় গোভক্ষণ একটি প্রাত্যহিক ও স্বাভাবিক রীতি ছিল। কিন্তু অর্থনীতির বিকাশ ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, কৃষির বিকাশের সঙ্গে গবাদিপশু খাদ্য ছাড়াও কৃষিকর্মে বিকল্প ব্যবহার হতে শুরু হল। শুধু তাই নয়—বিকল্প খাদ্যও এই কৃষিই মানুষের জীবনে এনে দিল। ফলে ধীরে ধীরে গোভক্ষণ একটি বিরুদ্ধচারণে পরিণত হল, গোধন অবধ্য বলে নির্দেশিত হয়। গোধন বর্ণিত হয় অঘ্না বলে; যদিও গোভক্ষণের রীতিটি সম্ভবত তখনো চালু ছিল।

### ২খ.৪.১ কৃষির প্রসার

কৃষির সূচনায় ইঙ্গিত *ঋগ্বেদ*-য়েই পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত নদী ও তার অববাহিকা থেকে খোদিত প্রণালীকে গাভীমাতা ও গোবৎসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণদাত্রী নদী ও তার প্রণালী কৃষিক্ষেত্রের নিকটে প্রবাহিত হয়ে ক্ষেত্রে জল প্রদান করে। কর্ষিত জমিকে ক্ষেত্র বলা হয়েছে। স্থান-বিশেষে জমির স্তরভাগ করা হয়েছে, যথা উর্বরা ও অর্তন। ফসল প্রধানত দু'বার ফলানো হত সারা বৎসরে। সাধারণত যব ও ধান্য এই দুই শস্যের কথা *ঋগ্বেদ*-এ পাওয়া যায়। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণে গোধূম, প্রিয়ঙ্গ, মুদ্গ, মাষ, মসুর ইত্যাদি শস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈদিক সাহিত্যে অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা সামগ্রিকভাবে একটি জনজাতির ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। এই পরিবর্তন ধাপে ধাপে সাধিত। *ঋগ্বেদ*-এ যে কৃষি, যব শস্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা পরবর্তীকালে বহুলাকার ধারণ করেছে। মনে রাখতে হবে যে বৈদিক আর্যদের মধ্যে কৃষির বিকাশে ঋগ্বৈদিক যুগের সমসাময়িক, পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি ও অন্যান্য তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতিগুলির ভূমিকা ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতকে উত্তর ভারতের রাজস্থানে গৈরিক বর্ণ-মৃৎপাত্র ব্যবহারকারী সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাম্রভাণ্ডারগুলির চিহ্নও স্থানে স্থানে পাওয়া গেছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সঙ্গে ঋগ্বৈদিক সংস্কৃতি জড়িত বলেও কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। সুতরাং কৃষি-অর্থনীতি বা কারিগরী শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। বৈদিক সভ্যতা দ্বীপের মতো নির্জনে, বিচ্ছিন্ন ধারায় বৃদ্ধি পায়নি। হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তী ধারা ও অন্যান্য তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতিগুলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়া থেকেই পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটের কিছু অঞ্চলে বর্তমান ছিল। এদের মধ্যে নগরসভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি ক্ষীণ হয়ে পড়লেও জীবনধারণের প্রধান উপজীবিকাগুলি বজায় ছিল। এই জনগোষ্ঠীগুলি ধান, গম, যব, মসুর, কলাই, তুলা ও তৈলবীজের চাষ করতেন। মুরগী, ছাগল, ভেড়া, গবাদিপশু ইত্যাদিও পালন করতেন। এদের মধ্যে মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প,

দারুশিল্পও প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত জীবিকা ও বৃত্তিগুলি বৈদিক সমাজেও প্রচলিত হল। তবে হস্তশিল্পর ক্ষেত্রে ধাতুর ব্যবহার বৈদিক আর্যরা সম্ভবত ভারতে আসার পূর্বেও করেছেন।

*ঋগ্বেদ*-এ যবের উল্লেখ বারংবার করা হয়েছে। এযুগের প্রধান শস্য ছিল যব। 'ধান্য' শব্দটিও পাওয়া যায়। সম্ভবত এ সময়ে 'ধান্য' শব্দটি সাধারণভাবে খাদ্যশস্য বোঝাতেই ব্যবহৃত হত। পরবর্তী কালে অবশ্য ধান্য ও গোধূম, দুটি পৃথক খাদ্যশস্যের উল্লেখ রয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এ 'কৃষি', 'কর্ষক', বা 'কৃষ্টি' শব্দগুলি পাওয়া যায়। কৃষককে বলা হত কৃষ্টি এবং স্বাভাবিকভাবেই কৃষিজীবি মানুষ সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় এই শব্দটি সমগ্র জনসমষ্টি সম্পর্কে প্রয়োগ করা হত। শব্দের এই প্রয়োগ বিশ্লেষণ করলে বৈদিক সমাজে প্রধান জীবিকারূপে কৃষির বিকাশ ও সম্প্রসারণের চিত্রটি পরিস্ফুট। ভারতীয় উপমহাদেশে আগমনের পরে যে অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে বৈদিক সভ্যতার সর্বপ্রথম উন্মেষ ঘটে, তা নির্ধারণ করা যায় *ঋগ্বেদ*-এ উল্লিখিত নদীগুলির বিবরণ থেকে। ক্রুম বা কুর্‌রম, কুভা বা কাবুল, সিন্ধু, মেইৎনু ইত্যাদি নদীগুলি আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এর সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে গোমতী বা গোমাল, সরস্বতী, বিতস্তা (ঝিলম), বিপাশা (বিয়স), অসিক্নী (চন্দ্রাভাগা বা চেনাব), পরুষ্নী বা ইরাবতী (রাভি) ও শতদ্রু (সাটলেজ) নদীর। এই নদীগুলি পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, কাশ্মীর ও পাঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং বৈদিক আর্যরা যে ধীরে ধীরে ঋগ্বৈদিক যুগেই পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন তা প্রমাণিত। কিন্তু গঙ্গা বা যমুনার কথা শুধু একবারই *ঋগ্বেদ*-এর প্রক্ষিপ্ত দশম মণ্ডলে উল্লিখিত। ঋগ্বেদিক আর্যদের জীবনযাত্রা সম্ভভবত পাকিস্তানের সিন্ধু নদী ও তার অন্যান্য উল্লিখিত উপনদীগুলির অববাহিকা অঞ্চলে অর্থাৎ আফগানিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, পূর্ব পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে সীমাবদ্ধ ছিল।

কৃষির দিক থেকে দেখা যায় যে এই নদীমাতৃক অঞ্চল পূর্বের অধ্যুষিত ইরান ও পশ্চিম আফগানিস্তান অঞ্চলের থেকে অনেক বেশি সম্ভাবনাময় ও সুজলা। এরই সঙ্গে এই অঞ্চলে অবস্থিত পরবর্তী হরপ্পীয় ও অন্যান্য তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বৈদিক আর্যরা নতুন নতুন শস্য ও উন্নত কৃষিপদ্ধতির সাথে পরিচিত হয়। *ঋগ্বেদ*-এর প্রথম মণ্ডলে আমরা লাঙলের ব্যবহার ও শস্য রোপণের উল্লেখ পাচ্ছি। ভৌগোলিক দিক থেকে এই অঞ্চলগুলি প্রধানত যব, খেসারি ও শণ চাষের উপযুক্ত। ঋগ্বেদের গোড়ার দিকে তাই যবের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, কিন্তু কৃষিকর্মে গোড়া থেকেই আর্যরা সরাসরি যুক্ত ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যাযাবর পশুচারক এই আদি আর্যদের কৃষিকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকাটা সম্ভবপর নয়। কিন্তু *ঋগ্বেদ*-এর রচনার কাল যদি আমরা খ্রিঃপূঃ ১৫০০ থেকে খ্রিঃপূঃ ১২০০ বলে ধরে নিই তবে এই প্রায় তিনশো বছরের শেষের দিকে তাঁদের কৃষিকর্মে প্রবেশ ও অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পদ্ধতিতে তাঁরা প্রাগার্য ও সমকালীন অন্যান্য কৃষিনির্ভর সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে ধরে নেওয়া ভুল হবে না। *ঋগ্বেদ*-এর একটি শ্লোকে সম্ভবত কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অরণ্য পরিষ্কার করে ভূমিসংস্কারের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে দেবতারা স্বধিতি হস্তে (কুঠার) সঙ্গী পরিবৃত হয়ে কাঠ কাটতে কাটতে অগ্রসর হচ্ছেন। সেই কাঠ অগ্নিতে নিক্ষেপিত হচ্ছে। গ্রিফিথ তাঁর অনুবাদে এই স্তবকে কৃষি সম্প্রসারণের ইঙ্গিত বলে লক্ষ্য করেছেন এবং লুডভিও এই শ্লোকে কৃষির বিকাশ বর্ণিত হচ্ছে বলে মনে করেন এ কথা গ্রিফিথ উল্লেখ করছেন।

### ২খ.৪.২ পশুপালন

ঋগ্বৈদিক ধর্মে দেবগণের মধ্যে অশ্বিনীকুমারদ্বয় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। এঁরা গবাদি পশুর সংরক্ষণ ও কৃষিকার্যের হিতসাধন করেন বলে বৈদিক আর্যদের বিশ্বাস। অশ্বিনীদ্বয় যব রোপণ করে ও লাঙ্গালে অধিষ্ঠিত হয়ে জনসাধারণের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে প্রশংসিত হয়েছেন। ইন্দ্রেরও আরাধনা হয়েছে কৃষিকাজে মঙ্গলসাধনের জন্য। ইন্দ্রকে লাঙ্গালের সিরার উপর অধিষ্ঠান করার জন্য আবাহন করা হয়েছে। পূষণের প্রতি প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে তিনি লাঙ্গালের সিরাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কৃষিক্ষেত্রকে ব্যক্তিবিশেষরূপে কল্পনা করা হয়েছে এবং সাংবাৎসরিক ভাবে কৃষিক্ষেত্রের জল নিষ্কাশনের রীতিও বর্ণিত হয়েছে। *ঋগ্বেদ*-এর প্রথম ও অষ্টম মণ্ডলে ষণ্ড-চালিত লাঙ্গালের দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণের চিত্রটি পাওয়া যায়। এই লাঙ্গালের ফলা গোড়ার দিক উদুম্বর বা ডুমুর এবং খরিদ বা খয়েরের মতো কঠিন কাষ্ঠনির্মিত। লোহার প্রচলন তখনো হয়নি। লাঙ্গাল, সিরা, কর্ষিত রেখা বা সীতা ইত্যাদির পূজা ও ব্যক্তি-কল্পনা *ঋগ্বেদ*-এর বহু অংশে বর্ণিত হয়েছে। সৃণী বা কাস্তে দিয়ে শস্য কাটার কথাও রয়েছে। কৃষিকর্মের সঙ্গে জড়িত বহু ধর্মীয় রীতি, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের সূচনা *ঋগ্বেদ*-এ পাওয়া যায় যা থেকে ক্রমশ কৃষির প্রসারণের ছবি ফুটে ওঠে।

### ২খ.৪.৩ উৎপাদন-প্রযুক্তি ও শস্যসম্ভার

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে কৃষিক্ষেত্রে লাঙলের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ খদির কাষ্ঠ নির্মিত লাঙ্গালকে অস্থির ন্যায় কঠিন বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। লাঙলের সিরাটি একটি দণ্ড বা ঈষার সঙ্গে যুক্ত এবং তার সঙ্গে একটি যূপ সংযুক্ত থাকত যা ষণ্ড-পৃষ্ঠে ন্যস্ত হত। সেই সময় সম্ভবত বহুসংখ্যক ষণ্ডের ব্যবহার হত লাঙল দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণের জন্য। *অথর্ববেদ*-এর বর্ণনায় চার, ছয়, আট, বারো—এমনকী, চব্বিশটি পর্যন্ত ষণ্ড যুত লাঙলের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে যা বাস্তবে সম্ভবপর ছিল না বলেই মনে করা যায়, তবে দুটি বা চারটি ষণ্ডের ব্যবহার হওয়া সম্ভব এবং এই লাঙল নিশ্চয় অত্যন্ত ভারী ও মজবুত ছিল। লাঙল নির্মাণে খরিদ বা উদুম্বর (খয়ের এবং ডুমুর) কাষ্ঠের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলে জানা গেলেও পরবর্তীকালে লাঙলের সিরাটি ধাতু নির্মিত ছিল, যাকে পবিরবৎ বা সুতীক্ষ্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-য়েও লাঙলের ফলায় ধাতুর ব্যবহার উল্লিখিত হয়েছে। রামশরণ শর্মা মনে করেন, পরবর্তী বৈদিক যুগে লাঙলের ফলায় লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সারের ব্যবহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়—'সকৃৎ' বা গোময় এবং 'করীষ' বা শুষ্ক গোময়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বৈদিক আর্যদের পূর্ব-অভিমুখী অভিযানের কথা রয়েছে। সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে বৈদিক আর্যরা এই সময়ে শতদ্রু ও গঙ্গা-বিভাজিত অঞ্চল ছাড়িয়ে আরও পূর্বে গঙ্গা ও যমুনার অববাহিকা ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই অভিযানের পিছনে কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ ও প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, গাঙ্গেয় সমভূমি সুজলা ও নদীতীরবর্তী অঞ্চল অত্যন্ত সুফলা। কিন্তু নদী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলগুলি গভীর শিকড়বিশিষ্ট বৃক্ষ সমৃদ্ধ হওয়ায় চাষের জন্য উপযোগী ছিল না। এই ঘন মৌসুমী অরণ্যকে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রয়োজন ছিল লোহার ব্যবহার। পরবর্তী বৈদিক যুগে, অন্ততপক্ষে খ্রিঃপূঃ সপ্তম শতাব্দীর আগে সাধারণ জীবনে ও কৃষিকর্মে লোহার নিত্যপ্রচলন শুরু হয়নি। সুতরাং বিদেঘ মাধব তাঁর পুরোহিত গৌতম রাহুগণের সঙ্গে সরস্বতী নদীর তীর থেকে পূর্ব অভিমুখে যে অগ্রসর হয়েছিলেন সদানীরা নদীর তীর অবধি,

তা সম্ভব হয়েছিল বৃক্ষরাজিতে অগ্নি নিক্ষেপ করে। বন পুড়িয়ে কৃষির জন্য পরিসর ক্ষেত্র প্রস্তুত করার রীতিটি রপ্ত হয়েছিল। এই বন কেটে এবং পুড়িয়ে চাষের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তত করা 'ঝুম' চাষের পদ্ধতিটি খুবই প্রাচীন এবং পূর্ব হিমালয়ের প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। সুতরাং *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বৈদিক আর্যদের কৃষি সম্প্রসারণের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগে শস্যতালিকাও দীর্ঘায়িত হল। যব ও তিল এবং সম্ভবত ধানের সঙ্গে যুক্ত হল গোধূম যা পূর্বে উল্লিখিত ছিল না। এ ছাড়া, মাষ কলাই, মুদ্গ, খল্ব ইত্যাদি ডাল জাতীয় শস্য কৃষির আওতায় এল। প্রিয়ঙ্গু নামে একপ্রকার শস্যেরও নাম পাওয়া যায় যা সম্ভবত অত্যন্ত ক্ষুদ্র দানা বিশিষ্ট কোন জাতের বাজরা। ইক্ষুর ফলন ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় *অথর্ববেদ*-এ। যব ও ধান্যর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শস্যের চাষ হতে দেখা যায়। গোভিধূক নামে একপ্রকার যবের কথা বলা হচ্ছে যা গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য উত্তম বলে বর্ণিত[৯৩]। উপবক ও ইন্দ্রযব নামে আরও দুই প্রকার যবের উল্লেখ রয়েছে।

ধানের মধ্যেও প্রকারভেদ হল। 'কৃষ্মব্রীহি' ও 'শুক্লব্রীহি', অর্থাৎ যার বর্ণ কৃষ্মাভ তা কৃষ্মব্রীহি এবং বর্ণ শুক্ল হলে শুক্লব্রীহি। 'হয়েন' ধান সম্পূর্ণ এক বছর লাগত পাকতে। 'নিবার' ধান নিচু জলাভূমি অঞ্চলে ভাল ফলত। মহাব্রীহিকে ব্রীহির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা 'সম্রাট' বলা হচ্ছে। এ ছাড়াও, বিভিন্ন জাতির ডাল, সব্জী ও তৈলবীজের উল্লেখ, প্রকারান্তরে একটি মিশ্র কৃষিব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং দেখা যায় পরবর্তী বৈদিক যুগে বিভিন্ন সময়ের উপযোগী, বিভিন্ন রকম চাহিদার যোগান দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতের শস্যের নির্বাচন, বাছাই ও ফলন ঘটেছে। অর্থাৎ একটি সুপরিকল্পিত কৃষিব্যবস্থার বিকাশ ঘটছে। এক্ষেত্রে সেচব্যবস্থার বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। 'রোধ' অর্থাৎ বাঁধের ব্যবহার সম্ভবত কৃষিক্ষেত্র সিঞ্চনের জন্য নদীর খাতে তৈরি করা হত।

সকল প্রকার কৃত্রিম সেচব্যবস্থাকেই 'খনিত্রী' বলে অভিহিত করা হচ্ছে, যেমন কুয়ো, হ্রদ, নালা ইত্যাদি। হ্রদ বেসান্ত, বেসান্তি বিভিন্ন আয়তনের জলাধার বা জলাশয় যা ক্ষেত্রসিঞ্চনে ব্যবহৃত হত। *অথর্ববেদ*-এ বলা হয়েছে কৃত্রিম নালা বা 'কুল্য'র কথা, যা জলাশয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকত। এই 'কুল্য'গুলি কৃষিক্ষেত্রে জল সঞ্চারের কাজে লাগত। বন ও জলাভূমি সংস্কারের কথা আগেই দেখা গেছে। ধাতু-নির্মিত লাঙলের ব্যবহার ও কৃত্রিম সেচব্যবস্থার সূচনা এবং একই সঙ্গে বহু উপজাতির শস্যের ফলন কৃষি-অর্থনীতির অগ্রসরকে চিহ্নিত করে।

কৃষির সঙ্গে সঙ্গে জীবিকারূপে হস্তশিল্পের উল্লেখও ঋগ্বৈদিক যুগ থেকেই পাওয়া যায়। পশম ও কৌষেয় বস্ত্র ও পরে সুতি বস্ত্র বুননের বিবরণ বৈদিক সাহিত্যে বারবার পাওয়া যায়। মৃৎপাত্র, দারুনির্মিত আসবাব ও পরিবহন, বংশনির্মিত বস্তু, তেল, চর্মজাত দ্রব্য, সুরা ও ধাতব যন্ত্রপাতি এবং হাতিয়ারের উল্লেখ বৈদিক সমাজে ক্রমবর্ধমান হস্তশিল্পের চিত্র তুলে ধরে। *ঋগ্বেদ*-য়েই এর সূচনা দেখা যায়। ঋভুগণকে সুচারু কারুশিল্পীরূপে প্রশংসা করা হয়েছে। ভৃগুগণ প্রশংসাধন্য ছিলেন রথনির্মাণে দক্ষতার জন্য। ভেড়ার পশম দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র বুননের কথাও জানা যায়। বস্ত্র প্রস্তুতকারক 'বায়' বলে অভিহিত হতেন। তবে বস্ত্র বুননের ক্ষেত্রে মহিলা শিল্পীর কথাই বেশি বলা হয়েছে। দারুশিল্পের কথাও পাওয়া যায় *ঋগ্বেদ*-এ। তষ্টৃ বা তক্ষকারগণ কাষ্ঠনির্মিত রথ, চাকা, নৌকা ও পাত্র প্রস্তুত করতেন। রথকার ও তক্ষকারগণ বৈদিক সমাজে যথেষ্ট মর্যাদা পেতেন। তাঁরা রত্নিন-রূপে নব অভিষিক্ত রাজার দ্বারা সমাদৃত হতেন।

## ২খ.৫ শিল্প প্রয়াস

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শিল্পের তালিকা শস্যের মতোই আরও দীর্ঘ হল। *রাজসনেয়ী সংহিতা*-এ একটি সম্পৃক্ত তালিকা পাওয়া যায় যা হস্তশিল্প সম্প্রসারণের পরিচায়ক। এতে কৌলাল বা মৃৎশিল্পী, কর্মার বা ধাতুশিল্পী, মনিকার, ইষকার (তীর নির্মাণ), ধনুকার রজ্জুকার (দড়ি নির্মাতা), জ্যাকার (ধনুকের ছিলা প্রস্তুতকারী), সুরাকার, বাস, পল্পূলী বা রজক, রঞ্জয়িত্রী (কাপড় রঙ করে যে নারী), চর্ম্মন্ন (চর্মকার), হিরণকার (স্বর্ণকার) ইত্যাদি হস্তশিল্পী বা কারিগর ও কারিগরী বৃত্তির কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়কার যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে, বিশেষত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশে, তা এ ধরনের হস্তশিল্প বিকাশেরই পরিচায়ক, অর্থাৎ উত্তর ভারতে সমসাময়িক প্রায় সব সংস্কৃতির সমাজের এই ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল—বৈদিক সভ্যতায় পৃথকভাবে কিছুর উদ্ভাবন ঘটেনি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল লোহার প্রথম উদ্ভব, বিকাশ ও লোহা ব্যবহারের প্রসার। সংস্কৃত ভাষায় লোহার প্রতিশব্দ 'অয়স'। *ঋগ্বেদ*-এ যদিও 'অয়স' শব্দটি প্রথম পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এই 'অয়স' ধাতু বলতে যা ব্যবহৃত হত তাকেই বোঝাত, পৃথকভাবে লোহাকে নয়। লোহার ব্যবহার খ্রিঃপূঃ ১৫০০ শতাব্দীতে সূচিত হয়নি। সর্বপ্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে লোহা পাওয়া যায় খ্রিঃ পূঃ ১০০০ শতাব্দীতে—রাজস্থানের তাম্র প্রস্তর সংস্কৃতির অহর-এ এবং চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র সংস্কৃতির নোহ্-তে। এছাড়া, কর্ণাটকের হাল্লুর-এও লোহার ব্যবহার সূচিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে পরবর্তী সাহিত্যে দেখা যায় পৃথকভাবে ধাতুর নামকরণ—লোহিত বা তামা, কৃষ্ণায়স বা শ্যামায়স (লোহা), হিরণ্য বা স্বর্ণ, রজত বা রূপা, কাংস বা কাঁসা, ত্রপু বা টিন ও সীসা—অর্থাৎ বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত ধাতুসংকর পদ্ধতিও শুরু হয়েছিল। ইতিপূর্বে লোহা ছাড়া অন্যান্য ধাতুর মিশ্রণ সংঘটিত হয়েছে হরপ্পীয় সভ্যতার কারিগরদের হাতে। লোহা অন্যান্য ধাতুর সাথে সংযুক্ত হলে জীবনে এক নতুন মাত্রা এল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। *অথর্ববেদ* ও *রাজসনেয়ী সংহিতা*-এ নিশ্চিতরূপে লোহার ব্যবহার চিহ্নিত করা যায়। লোহা কৃষ্ণায়স বা শ্যামায়স নামে সূচিত হল। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বলা হয়েছে যে অশ্বমেধ যজ্ঞে বধ্য অশ্বটি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত পশু লোহার অস্ত্রে বলি দেওয়া হত। অর্থাৎ যেহেতু লোহা সাধারণ কৃষকের ব্যবহৃত ধাতু তাই অশ্বমেধের অশ্বটি, যা রাজশক্তির প্রতিভূ, তাকে লোহার অস্ত্রে বধ করা যাবে না। এই উল্লেখ থেকে দুটি ধারণা স্পষ্ট যে *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এর রচনাকালে কৃষিকর্মে লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে এবং সাধারণ কৃষক অন্যান্য ধাতব ও প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে লোহার ব্যবহার করতে শুরু করেছে। লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার যে পরবর্তী বৈদিক শিল্প তথা সমগ্র অর্থনীতিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল তা অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকেরাই স্বীকার করেন। লোহা ব্যবহারের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বিশেষ করে পরবর্তী উত্তর ভারতের উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে পাওয়া গেছে যা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে লোহার ব্যাপকতর প্রচলন নির্দিষ্ট করে।

## ২খ.৬ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি

*ঋগ্বেদ*-এ বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে, যদিও এই জীবিকাটি সম্পর্কে গোড়ায় বৈদিক আর্যদের অনুদার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই সংহিতায় 'পণি'দের উল্লেখ রয়েছে যাঁদের বাণিজ্যে পারদর্শী ও চতুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত এই পণিরা অনার্য জাতির লোক ছিলেন। এঁরা কৃষ্ণবর্ণ, খর্বদেহ, খর্বনাসা, স্থূলভাষী বলে বর্ণিত। ঋগ্বেদিক আর্যরা সর্বদাই এঁদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার শংকায় ভুগতেন। বৈদিক আর্যরা পণিদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়েছে *ঋগ্বেদ*-এ, যাতে পণিরা ধ্বংস হয়। বাণিজ্যের প্রতি এই ঘৃণার মনোভাব অবশ্য পরে অপসারিত হয়েছিল। *ঋগ্বেদ*-য়েই তার প্রমাণ রয়েছে। সামগ্রী বিনিময়ের মূল্যরূপে শুল্কর উল্লেখ রয়েছে। ইন্দ্রের কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি বিক্রয়ের কথা জানা যায়। *ঋগ্বেদ*-এ হিরণ্যচূর্ণ থলিতে মাটির জালায় ভরে রাখার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া, সুবর্ণপিণ্ড বা হিরণ্যপিণ্ড জমা করার কথাও রয়েছে। 'নিষ্ক' শব্দটি সম্ভবত এই হিরণ্যপিণ্ডগুলিকেই বোঝাত। তবে বিনিময়ের মূল্য হিসাবে সুবর্ণ-খণ্ডের ব্যবহার এ যুগের বৈদিক আর্যরা জানতেন না। চলাচলের জন্য ষণ্ডবাহী 'অনস' অর্থাৎ শকটের কথাও বলা হয়েছে। তবে *ঋগ্বেদ*-এ বাণিজ্যের যে উল্লেখ রয়েছে তা প্রধানত 'পণি' ও 'অসুর'দের সম্বন্ধে। এই 'পণি' বা 'অসুর'গণ অনার্য—হরপ্পীয় সভ্যতার পরবর্তী সংস্কৃতির মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই এই সংস্কৃতিগুলিতে পূর্বের হরপ্পীয়দের ন্যায় না হলেও অন্তত কিছু পরিমাণ বাণিজ্যিক কার্যকলাপ অব্যাহত ছিল। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে স্থলপথে এবং জলপথে, পূর্বের তুলনায় সীমিতভাবে চালিত ছিল। পণিদের দুঃসাহসিক অভিযান, অর্থলোভ ও বাণিজ্যিক চাতুর্য সম্ভবন্ধে *ঋগ্বেদ*-য়ের বিবরণ উন্নত অনার্য উপজাতিগুলির বাণিজ্যিক পারদর্শিতাই নির্দেশ করে।

### ২খ.৬.১ বাণিজ্যপথ

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 'বণিজ্' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। *যজুর্বেদ*-এ বণিজ্ কথাটি স্পষ্টভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বণিক্ এবং 'বাণিজ' অর্থাৎ বণিকের পুত্ররূপে। এই বণিকেরা আর্য বর্ণভিত্তিক সমাজের অংশ বলে বর্ণিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বাণিজ্য জীবিকাটি বৈদিক সমাজের অঙ্গ হয়ে পড়ছে এবং বণিকগোষ্ঠী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হচ্ছেন। এঁরা বৈশ্যবর্ণের অংশরূপে পরিচিতি পেলেন। স্থলপথ ও জলপথ দু'ভাবেই বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। পূর্বের হরপ্পীয় সভ্যতার যুগে যে সব বাণিজ্য চালিত ছিল সেগুলি ছাড়াও পূর্ব অভিমুখী নানা নতুন পথে পণ্য চলাচল শুরু হল। 'পথিকৃৎ' কথাটি *ঋগ্বেদ* ও *অথর্ববেদ*-এ পাওয়া যায় যা নতুন পথের দিশারীকে চিহ্নিত করে। স্থলপথে বাণিজ্য গোচালিত শকটেই বেশি হত। *ঋগ্বেদ*-এ জলপথে বাণিজ্যেরও উল্লেখ রয়েছে, অবশ্য এক্ষেত্রে 'পণি'দের কথাই বলা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে অনার্য হরপ্পীয়দের উত্তরসূরি 'পণি'রা পূর্বের হরপ্পীয়দের মতো না হলেও আংশিকভাবে অন্তত জলপথে বাণিজ্যের ধারাটি বজায় রেখেছিল। তবে এই জলপথ 'সমুদ্র' ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ বর্তমান। সমসাময়িক কালের নৌ-ব্যবস্থায় সমুদ্র-বাণিজ্যের সম্ভাবনাটি ক্ষীণ। অবশ্য পরবর্তী বৈদিক যুগে সমুদ্র-উপকূল ধরে নৌবাণিজ্য সূচিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

### ২খ.৬.২ বিনিময় ও মুদ্রার ব্যবহার

বিনিময়-প্রথার ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের পরিমাপ করার প্রচলন ঋগ্বৈদিক যুগেই শুরু হয়েছিল। গোড়ার দিকে সামগ্রিকভাবে পণ্য-বিনিময় থেকে ধীরে ধীরে প্রথমে গোধন ও পরে ধান্য পরিমাপ হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল।

পণ্য-বিনিময়ের মূল্য 'শুল্ক' বলে অভিহিত হল এবং গোধনকে মূল্য বা শুল্করূপে স্থির করল। পরে কৃষি-অর্থনীতির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শস্য শুল্করূপে গোধনের স্থান অধিকার করল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য কয়েকটি শব্দ ও তার বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সময়ে সম্ভবত ধাতব মুদ্রাও শুল্ক বা বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। কোন কোন ঐতিহাসিক 'নিষ্ক', 'কৃষ্মল' বা শতমান শব্দগুলিকে মূল্যনির্ধারক ধাতবখণ্ডরূপে গণ্য করেন এবং কোনও কোনও ঐতিহাসিক 'কৃষ্মল' বা শতমান একেকটি পরিমাপের মুদ্রা ছিল বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য শতমান একটি বিশেষ তৌলরীতির মুদ্রারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বৈদিক যুগে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও অর্থনীতিতে যে অগ্রগতি দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বিনিময় প্রথায় বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বলে মনে করা যায়। যার ফলে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি মুদ্রার প্রচলন নিঃসন্দেহে নজরে আসে।

## ২খ.৭ সম্পদের মালিকানা

কৃষি ও শিল্প উৎপাদন এবং বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পরবর্তী বৈদিক সমাজের রূপান্তর ঘটে। পূর্ববর্তী কৌমগোষ্ঠী ও যৌথ মালিকানার সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে তাদের গুরুত্ব হারায়। সমাজে সম্পদ ও বিশেষত উদ্বৃত্তের উদ্ভবের ফলে সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্যের সূচনা হয়। সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের অভিভাবক ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ ও রাজন্যগণ এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় সব থেকে বেশি লাভবান হন। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ, ধনোৎপাদক বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে একে অপরকে সহায়তা করেন। এর ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করার মাধ্যমরূপে কর ব্যবস্থার প্রচলন হয়। কর ব্যবস্থার তাত্ত্বিক দিকটি ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট। পূর্বের কৌমসমাজে দলপতি বা রাজাকে সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় 'বলি' বা তাঁদের আহরিত বা লুণ্ঠিত ধনের একাংশ উপঢৌকন দিতেন। কিন্তু উদ্বৃত্ত সম্পদ বৃদ্ধি ও সমাজে ধর্মীয় প্রভাব ও রাজশক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে দেয় বলি বাধ্যতামূলক হয়ে উঠল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজা বলিহৃৎ, অর্থাৎ বলি-আহরণকারী ব্যক্তি বলে অভিহিত হলেন। এ ছাড়া, 'ভাগ ও শুল্ক'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সম্পদের মালিকানা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ জমির মালিকানা সম্ভবন্ধে বলা হয়েছে—ক্ষত্রিয় বা রাজা যদি কৌমের সর্বসম্মতিক্রমে কোন ব্যক্তিকে জমির অধিকার দেন তবেই জমির উপর স্বত্ব প্রমাণিত হয়। বৈদিক সাহিত্যের উপাদান থেকে ভি. এ. স্মিথ., ই. ডব্লিউ. হপকিন্স, জি. ব্যুলর প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন, এ যুগে জমির উপর রাজার মালিকানাই প্রচলিত ছিল। তবে অন্যদিকে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উপস্থিতিও বৈদিক সাহিত্যে প্রমাণিত। *ঋগ্বেদ*-এ এর উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া, ক্ষেত্রপতি এবং ক্ষেত্রপত্নী অর্থে জমির মালিক ও তার স্ত্রীকেই নির্দেশ করা হয়েছে। তবে কৃষিজাত দ্রব্যের উপর রাজাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছিল পরবর্তী বৈদিক সমাজে এবং এর প্রতিফলন ঘটেছিল প্রশাসনিক সংগঠনে। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বিশেষ কর্মচারীপদ সৃষ্ট হয়েছিল—'সংগ্রহীতৃ'। 'রত্নিন'রূপে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই রাজকর্মচারীর উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সমাজে লক্ষণীয় এই পরিবর্তনে উত্তর ভারতে এক সামগ্রিক পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি গাঙ্গেয় উপত্যকায় ঐতিহাসিক নগরায়ণের উদ্ভব ঘটে।

## ২খ.৮ বৈদিক যুগের রাজনৈতিক সংগঠন

বৈদিক অর্থনীতি, কৃষি বা শিল্পে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সূচনা, সম্পত্তিগত ধারণার জন্ম দেয়। ধন ও ধনোৎপাদনের সঙ্গে ধন নিয়ন্ত্রণের নিবিড় সম্পর্ক। ধন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমরূপে রাজনৈতিক শক্তির প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ পূর্বে অর্থাৎ হরপ্পীয় যুগে ঘটে থাকলেও সর্বপ্রথম এর সাহিত্যিক নিদর্শন বৈদিক সাহিত্য থেকেই মেলে। রাজনীতির মতো কৃত্রিম একটি সংগঠন সাহিত্যিক উপাদানের ভিত্তিতেই একমাত্র সম্যকরূপে উপলব্ধ হয়। সুতরাং বৈদিক যুগের রাষ্ট্র বা রাজনীতিগত ভাবনা ভারতে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম চিন্তাধারারূপে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়। *ঋগ্বেদ*-এ বিভিন্ন 'গোষ্ঠী'র উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া—'কুল', 'বিশ', 'জন', 'গণ' ইত্যাদি শব্দগুলির প্রত্যেকটিই একটি সমাজভিত্তিক সংগঠনকে নির্দিষ্ট করে যা রাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বসূরিরূপে গণ্য হতে পারে। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত যাযাবর জীবনযাত্রায় গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের কথা রয়েছে যা কতকগুলি উপজাতীয় স্তরে সংগঠিত হয়েছিল। রোমিলা থাপার *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত শক্তিশালী দাশরাজ্ঞের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পুরু, দ্রুহ্য, অনু, তুর্বশ এবং যদু ইত্যাদি প্রধান উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলি দাশরাজরূপে অভিহিত হয়েছেন। অপর শক্তিশালী গোষ্ঠীভুক্ত ভরতগণ এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। *ঋগ্বেদ*-এ আর্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উল্লেখ বারংবার এসেছে। তবে অপরদিকে আর্য এবং অনার্য উপজাতিগুলির মধ্যেও নিরন্তর সংগ্রাম চলছিল *ঋগ্বেদ*-য়ের যুগে। এই পারস্পরিক সংগ্রামের প্রধান কারণ গোধন সংরক্ষণ ও আহরণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। *ঋগ্বেদ*-য়ের প্রথম ও ষষ্ঠ মণ্ডলে রাজা বা গোষ্ঠীপ্রদানের বর্ণনা রয়েছে। গোধন দখলকারী দলপতিরূপে গোধন আহরণের জন্যই যে প্রধানত যুদ্ধ সংঘটিত করত সেই চিত্রটিও উজ্জ্বল। গোধন কাঙ্ক্ষিত বস্তু ও লুণ্ঠনের উপযোগী। *ঋগ্বেদ*-এ যুদ্ধের সমার্থক 'গবিষ্টি' শব্দটি এই দিকেরই ইঙ্গিত করে। *ঋগ্বেদ*-য়ের শাসকের অভিধা নরপতি, মহীপতি বা ভূপতি কোনওটিই না, তিনি 'গোপতি' (গবাদি পশুর অধিকর্তা) বলে আখ্যাত। 'গবিষ্টি' যে বীরের নেতৃত্বে চালিত, তিনি ইন্দ্ররূপে ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত। *ঋগ্বেদ*-এর নবম মণ্ডলে সোমের প্রতি প্রার্থনা করা হয়েছে "হে সোম, তুমি শোধিত হয়ে ইন্দ্রের সাথে একরথে আরোহণপূর্বক বিস্তর গাভী আনয়ন কর"। সোম রাত্রির পথপ্রদর্শক। তিনি পশুধন লুণ্ঠনের উপযুক্ত সহায়ক হবেন। ইন্দ্র বা নেতৃস্থানীয় যোদ্ধাকে তিনি সাহায্য করবেন। ধন আহরণ ও আত্মরক্ষায় নেতৃত্বদান করে দলপতি যোদ্ধা রাজনৈতিক সংগঠনে প্রথম অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠলেন। গৃহের বা পরিবারের অভিভাবক গৃহপতি থেকে কুলের নেতৃত্বে কুলপ বা কুলপতি ও গোষ্ঠীর স্তরে গোষ্ঠীপতির উত্তরণ, স্তরে স্তরে রাজনৈতিক সংগঠনের সোপান রচনা করেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক এককগুলি সময়ের সঙ্গে নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে এসে রাজনৈতিক সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। এ ভাবেই গ্রামণীর অধীনে গ্রাম, বিশপতির অধীনে বিশ্ ও রাজা বা রাজন্যবর্গের অধীনে রাষ্ট্রসংগঠন গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক শক্তির বিকাশে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সম্প্রদায় যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিল তা বৈদিক সাহিত্যে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। সাধারণের কাছে রাজশক্তির মাহাত্ম্য ও দৈবী চরিত্রের ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় স্বীকৃতি দান করে এই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় রাষ্ট্রশক্তির নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

## ২খ.৮.১ গণরাষ্ট্র

বৈদিক সাহিত্যে উপজাতীয় জীবনে গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি ধারার উজ্জ্বল উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। একদিকে পৃথকভাবে 'গণ'রাষ্ট্র বা সংগঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে রাজতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যে 'সভা'ও 'সমিতি'র অস্তিত্বে এই ধারার প্রচলন পরিলক্ষিত। গণরাষ্ট্রের উল্লেখ *ঋগ্বেদ*-এ ৪৬ বার। *অথর্ববেদ*-এ ৯ বার এবং *ব্রাহ্মণ সাহিত্যে*-এ বহুবার পাওয়া যায়। 'রাজনঃ সমিতাবিবা' কথাটি সম্ভবত সমিতি'তে বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দ বা রাজাদের অধিষ্ঠান করার ছবিটি তুলে ধরেছে। একাধিক রাজার মধ্যে একজন প্রধান রাজা বা 'জ্যেষ্ঠ রাজা'র কথাও বলা হয়েছে। সম্ভবত এই গণরাষ্ট্রে একাধিক রাজা ও গণনায়কের প্রচলন ছিল। রুদ্রের পুত্র মরুদগণের গণসংগঠনের কথা বলা হয়েছে যার সদস্যসংখ্যা ছিল ৪৯। দেবতাদের গণসংগঠনগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। এর থেকে গণসংগঠনগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। কে.পি. জয়সোয়াল মনে করেন যে, বৈদিক সমাজে রাজতন্ত্রের উত্থান আগে ঘটে এবং তার কিছু পরে গণরাষ্ট্রগুলির উদ্ভব হয়। রামশরণ শর্মার মতানুসারে বৈদিক গণগুলি মুখ্যত আর্যভাষীদের সভ্য সংগঠন ছিল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলির মধ্যে উপজাতীয় চরিত্র বর্তমান ছিল। বৈদিক সাহিত্যর সূত্র থেকে মনে হয়, উপজাতীয় স্তরে গণরাজ্য বা সংগঠনের অস্তিত্ব, রাজশক্তি আত্মপ্রকাশ করার বহু পূর্বেই বর্তমান ছিল। এই সংগঠনগুলির বিভিন্ন নাম ও গঠনের ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় যথা—স্বরাজ্য, যার শীর্ষে নেতৃত্ব করতেন স্বরাট্। তিনি রাজ্যের সমস্ত সদস্যের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করতেন এবং তাঁর নেতৃত্ব দান করতেন। সুতরাং এখানে সমব্যক্তিদের মধ্যে থেকে একজন স্বরাটের নির্বাচনের চিত্র পাওয়া যায়। তিনি বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। *শুক্লযজুর্বেদ*-এ উত্তর ভারতে স্বরাটের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। অপর একটি গণসংগঠন 'বৈরাজ্য' নামে অভিহিত হয়েছে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*-এ হিমালয়ের উত্তরে বৈরাজ্যের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। কুরু ও উত্তর মদ্রদের উল্লেখ রয়েছে যাঁরা বৈরাজ্য সংগঠন গঠন করেছিলেন। আলতেকার মনে করেন, বৈরাজ্য একটি রাজপদ-বিহীন রাষ্ট্রসংগঠন ছিল। *অথর্ববেদ*-এ গণ ও মহাগণ-এর উল্লেখ রয়েছে যা থেকে বিভিন্ন আকার ও স্তরে গণরাষ্ট্র সংগঠনের বিন্যাস ঘটেছিল বলে মনে হয়।

## ২খ.৮.২ সভা ও সমিতি

বৈদিক সমাজে রাজতন্ত্র বিকাশের সূচনা *ঋগ্বেদ*-য়েই লক্ষ্য করা যায়। রাজতন্ত্রের বিকাশে সভা, সমিতি ও বিদথর মতো গণসংগঠনগুলির অস্তিত্ব পূর্বেই উপজাতীয় ধারার প্রচলন নির্দেশ করে। তবে মূল গণরাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব সম্ভবত পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজশক্তির উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গৌণ হয়ে পড়েছিল। *অথর্ববেদ*-এ 'সভা' ও 'সমিতি'কে প্রজাপতির দুই যমজ কন্যারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বলা হয়েছে, যেমন রাজা তেমনই সভা এবং সমিতিও স্বয়ং প্রজাপতির নিকট অধিকারপ্রাপ্ত। *ঋগ্বেদ*-এর বর্ণনায় সভা ও সমিতির সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়। 'সভমেতি কিতবঃ' কথাটি থেকে সভায় দ্যূতক্রীড়া অনুষ্ঠিত হওয়ার চিত্রটি পাওয়া যায়। দৈবী সমিতির কথাও জানা যায় *ঋগ্বেদ*-এ। সমিতি সম্ভবত সমস্ত জনগণের বা বিশ'-এর জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু সভার সদস্যপদ সম্ভবত সীমিত ছিল। "সভ্যেয়ো বিপ্রো" এবং "রয়ি সভাবান্" এই কথাগুলি থেকে মনে হয়, ব্রাহ্মণ বা বিপ্র ও ধনশালী ব্যক্তিরাই বা মঘবানরাই সভার সদস্যপদে আসীন ছিলেন। রাধাকুমুদ মুখার্জীর মতে সভা ও সমিতি ভারতের আদি ও সুপ্রাচীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বৈদিক সাহিত্যে 'সভাপতি' ও 'সভাপাল'-

এর উল্লেখও পাওয়া যায়। জিমারের মতে সভা একটি গ্রামীণ সংস্থা ছিল যার পৌরোহিত্য করতেন গ্রামীণ বা গ্রামপ্রধান। কে.পি. জয়সোয়ালের মতে বৈদিক যুগের সভা প্রতিষ্ঠান এবং সমিতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। এ বিষয়ে ম্যাকডোনেল মনে করেন, বৈদিক যুগে রাজার নিরংকুশক্ষমতার পথে এক বিপুল অন্তরায় ছিল সমিতিতে প্রকাশ্য জনমত। অবশ্য ম্যাকডোনেল এবং কীথ তাঁদের *বৈদিক ইন্ডেক্স* গ্রন্থে এও লিখেছেন যে রাজপদে নির্বাচনের প্রচলনটি বৈদিক সমাজে আদৌ ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বৈদিক যুগের গোড়ায় রাজপদে নির্বাচন প্রচলিত থাকলেও রাজার দৈবী অধিকারের তত্ত্বটি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ক্রমশ প্রকট হয়। এর সঙ্গে জড়িত সভার ক্রমশ-পরিবর্তিত রূপটি। প্রথম থেকেই জনসংগঠনরূপে সভার চরিত্র অনেকটা সংকুচিত ছিল। সামাজিক বৈষম্যের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায় সভার সংগঠনে। পরবর্তী কালে সভা রাজসভায় পরিণত হয়। *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এ গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণকে রাজসভায় রাজার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। এ ছাড়া, সামাজিক জীবনে সভা অভিজাত সম্প্রদায়ের আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। পরবর্তী বৈদিক সমাজের রাজনৈতিক পটভূমিতে সভা কেন্দ্রীয় অভিজাত শাসনের অঙ্গ হয়ে পড়ে যার কেন্দ্রে রাজার অবস্থান ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

### ২খ.৮.৩ রাজশক্তির প্রাধান্য

ঋগ্বৈদিক রাষ্ট্র গঠনে রাজশক্তির অগ্রগণ্য ভূমিকাও লক্ষ্য করা যায়। এই সাহিত্যে রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন ভরতগণের নেতৃত্বে দিবোদাস ও তৎপুত্র সুদাস, অভ্যাবর্তিত চায়মান রুষমদের রাজা ঋণঞ্চয় অগ্নিবেশ, রাজপুত্র ইত্যাদি। রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক ছিল কিনা গোড়ার যুগে তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না—তবে একাধিক রাজ-তনয়ের নাম পাওয়া যায়। রাজন্যবর্গের সৃষ্টি হয়েছিল সেকথা সুস্পষ্ট। রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদের সমাজেই বিশ্ অর্থাৎ সাধারণ জনগোষ্ঠী ও রাজন্যবর্গের মধ্যে পৃথকীকরণ ঘটে গেছে। তবুও 'বিশ'-এর মতামত ও সামাজিক ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কারণ জমি ভোগদখলের ক্ষেত্রে রাজাকে বিশেষ সম্মতি গ্রহণ করতে হত। ঋগ্বেদের রাজার সর্বপ্রথম ভূমিকা ছিল নেতৃত্বদান, এর সঙ্গে যুক্ত ছিল উপজাতি এবং তার সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্বটিও। বিচারকার্যও রাজার দ্বারা পরিচালিত হত। রাজাকে যোদ্ধারূপে ইন্দ্র এবং বিচারকরূপে বরুণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

বৈদিক তত্ত্বে রাজার ক্ষমতা ঐশীশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। চার্লস ড্রেকমেয়ার মনে করেন যে বেদে এমন কিছু তথ্য নেই যা এই সমাজে রাজশক্তির ঐশ্বরিক চরিত্র নির্দিষ্ট করে। কে. পি. জয়সওয়াল তাঁর *হিন্দু পলিটি* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে হিন্দু (বৈদিক) রাজশক্তি একটি চুক্তি বা অঙ্গীকার থেকে উদ্ভূত, যে অঙ্গীকারের মাধ্যমে রাজা সমগ্র জনগণের সম্পদ বৃদ্ধির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ড্রেকমেয়ার এবং জয়সওয়াল দু'জনই বৈদিক রাজশক্তির উদ্ভব জনমত সাপেক্ষ বলে মনে করেন। এরই অপরদিকে ইউ. এন. ঘোষালের মতে ব্রাহ্মণ্য সমাজে রাজশক্তির উত্থান সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছাভূত। তিনি এক্ষেত্রে অবশ্য অনেক পরবর্তীকালে *ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য*-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। পি.ভি. কানের মতে ঘোষালের ধারণা সঠিক নয়। রাজশক্তির ঐশ্বরিক ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সূচনা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অবশ্যই লক্ষণীয়। কিন্তু *অথর্ববেদ*-এর সময়কাল অবধি বৈদিক রাজনৈতিক জীবনে জনগোষ্ঠী ও গণ প্রতিষ্ঠান, যথা সভা বা সমিতির গুরুত্ব যথেষ্টরূপে বজায় ছিল। *ঋগ্বেদ*-এর প্রার্থনা করা হচ্ছে "'বিশা-স্ত্বা সর্বাবাঞ্ছন্ত' অর্থাৎ সর্বজন যেন রাজাকে

আকাঙ্ক্ষা করেন। ঐ সংহিতাতেই আবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে রাজার শাসন শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন হয়, যাতে প্রজাগণ রাজাকে স্বেচ্ছায় বলি অর্পণ করেন এবং রাজার সার্বভৌমত্ব প্রসারে সহযোগিতা করে তাঁকে শত্রুমুক্ত করেন। *অথর্ববেদ*-এ রাজার পক্ষ থেকে সমস্ত বর্ণের প্রজাদের সম্মতি ও বিশ্বস্ততা কামনা করতে দেখা যাচ্ছে এবং এই শ্লোকেই রাজা অনুরোধ করেছেন প্রজাদের, তাঁরা যেন তাঁকে ত্যাগ না করেন, যেন তাঁরা স্বপক্ষে স্থির থাকেন এবং তাঁর কর্মে তৃপ্ত হন। নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন, এই সমাজে রাজার দৈবশক্তির দাবি বা অধিকার স্থাপন সম্ভব ছিল না।

কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে গোড়া থেকেই এর বিপরীতমুখী ধারাটি বিদ্যমান। রাজার দৈবী অধিকারের তত্ত্বটি বহুবার আলোচিত হয়েছে এই সাহিত্যে। এই দুই বিপরীতমুখী তত্ত্বের উপস্থিতি বহুমুখী রাজনীতি বা রাজনৈতিক ভাবনার প্রচলন ইঙ্গিত করে। *ঋগ্বেদ*-এ রাজা ত্রসদস্যু নিজেকে সর্বশক্তিমান, বিশ্বজগতের প্রভু, ইন্দ্র ও বরুণের ন্যায় মানবের রাজা অদিতির পুত্র পৃথিবী ও আকাশ বলে ঘোষণা করেছেন। এই ধারার প্রতিফলন পরবর্তী কালে *অথর্ববেদ*-য়েও বর্তমান। রাজশক্তির সাফল্য কামনা করে বলা হচ্ছে ঃ রাজা ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করুন, ধনপতি হন, বিশ্‌পতিরূপে বিরাজ করুন। তিনি ইন্দ্রের প্রিয়, ওষধি ও গবাদি পশুর প্রিয়, জনগণের একমাত্র প্রভু এবং মনুর বংশজাত উত্তম রাজা, তিনি সিংহ-প্রতীক এবং সমস্ত প্রজাগণকে (বিশ) ভক্ষণ করতে সক্ষম। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ রাজসূয় যজ্ঞের রাজাকে পুরোহিতগণ সবিতা, বরুণ এবং ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুতরাং একাধারে সর্বজননির্বাচিত রাজা ও দৈবশক্তিজাত রাজার দ্বৈত বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যের গোড়ার যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল যা পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজার দৈব অধিকারের পটভূমি রচনা করেছে এবং এরই সঙ্গে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রেরও উদ্ভব হয়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে দৈবী রাজশক্তির তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়েছে। ডি.ডি. কোশাম্বী *তৈত্তিরীয় সংহিতা* এবং *ব্রাহ্মণ* গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন ধরনের, যথা রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ, ঐন্দ্রমহাভিষেক, ইত্যাদি, অভিষেক ও তৎসংশ্লিষ্ট যাগযজ্ঞের মাধ্যমে রাজা বা দলপতিকে উপজাতীয় গণতান্ত্রিক গণ্ডির পাশ থেকে মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন। উপজাতীয় সভার উল্লেখ পরবর্তী সাহিত্যে নেই বললেই চলে। বর্ণভিত্তিক সমাজের পূর্ণ বিকাশ ও প্রসার ঘটে যায় এই যুগে। যার ফলে একটি শ্রেণীভিত্তিক সমাজের উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী ও বর্ণে বিভক্ত সমাজের শীর্ষে রাজশক্তির স্থান আরও সুদৃঢ় হয়। রাজশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজের অভিজাত বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষের সম্মতি ও সহায়তার দিকটিও বৈদিক সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। এক্ষেত্রে সমাজের গণতান্ত্রিক শক্তি নয় বরং উচ্চকোটির মানুষের প্রাধান্যই প্রকাশ পায়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজসূয় যজ্ঞের উপাঙ্গরূপে রত্নহিবংসি অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। নবাভিষিক্ত রাজা রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে একাদশ 'রত্নিন'-এর গমনপূর্বক তাঁদের উপঢৌকন অর্পণ করবেন। বিভিন্ন সাহিত্যগুলিতে রত্নিন'দের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা হলেন, ব্রাহ্মণ-পুরেহিত, মহিষী, বাবাতা, রাজন্য, গ্রামণী ভাগদুঘ, সংগ্রহীতৃ, সেনানী, সূত, ক্ষত্তৃ, তক্ষণ, রথকার, অক্ষবাপ ও গোবিকর্তন। এঁদের উল্লেখ প্রায় সব রচনাগুলিতেই বর্তমান। রাজন্য ও পরিবৃক্তির উল্লেখ দশম ও একাদশ রত্নিনরূপে *শতপথ* ব্রাহ্মণ ছাড়া সব রচনাতে বর্তমান। কিছু রচনায় বাবাত, তক্ষণ ও রথকারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ যজ্ঞের হোতাকে রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি বলা হয়েছে। এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছেন গোবিকর্তন ও পালাগল। কে.পি. জয়সওয়ালের মতে এই রত্নিনগণ ঋগ্বৈদিক

পূর্বের সমিতির অংশ ছিলেন। এঁরাই পরবর্তীকালে রাজাকৃতরূপে, রাজতন্ত্রের প্রসারে সহায়তা করেছেন। পরবর্তী বৈদিক যুগের রাষ্ট্রীয় সংগঠনে এই রত্নিনগণ উচ্চপদে আসীন। সম্ভবত এই রাজন্য, গ্রামীণ, তক্ষণ, রথকারগণ তাঁদের নিজস্ব বর্ণ বা কৌমের প্রতিনিধিরূপে রাজ-অভিষেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাজ অভিষেকে 'রত্নিন'দের এই উপস্থিতি গণতান্ত্রিক ধারার সংকোচন ও ক্রমশ অবলুপ্তির দিকটি নির্দেশ করে। ক্রমশ সমাজে একটি স্তরীভূত ক্ষমতার বিন্যাস প্রকাশ পায়। স্তরবিভক্ত সমাজের শীর্ষে আসীন রাজশক্তি ও তার সহায়ক পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাদের আসন দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে। রাজার রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারও বৃদ্ধি পায় ও এর দ্বারা রাজশক্তির উত্থান আরও সহজ হয়ে পড়ে। উদ্বৃত্ত ফসল ও প্রসারিত কৃষিক্ষেত্র সমাজে সম্পদের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভব ঘটায়। সম্পদ-রক্ষকের ভূমিকায় রাজশক্তির আত্মপ্রকাশ পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রথম ধাপ সৃষ্টি করে। উদ্বৃত্ত সম্পদ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে বাহুবল সাংগঠনিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা বোধ হওয়ায় ক্রমশ রাষ্ট্রশক্তি এবং রাজার জনসাধারণের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রীর উপর অধিকারও বৃদ্ধি পায়। *ঋগ্বেদ*-এ যে রাজা জনসাধারণের স্বেচ্ছায় দান 'বলি' নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পরিণত হলেন 'বলিহৃৎ' অর্থাৎ বলি আহরণকারী ব্যক্তিরূপে। রাজ্য, রাষ্ট্র ও ক্ষত্র কথাগুলি সমার্থকরূপে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত। তার কারণ, এ যুগে রাষ্ট্রসংগঠনের শীর্ষে ক্ষত্রিয়বর্গ তথা রাজার উপস্থিতি একটি অতি প্রচলিত স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজশক্তির প্রতি তাত্ত্বিক নেতৃবর্গ বা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতবর্গের পূর্ণ সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের একে অপরের সঙ্গে ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা এই দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রাধান্য রক্ষায় সাহায্য করে। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ নানা যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে যা রাজার পক্ষ থেকে জনসাধারণের নিকট গুরুত্বের জন্য অনুষ্ঠিত। রাজার সার্বভৌমত্বের কথা অশ্বমেধ, বাজপেয় বা ঐন্দ্রমহাভিষেক যজ্ঞের মাধ্যমে প্রচারিত। *অথর্ববেদে* বলা হয়েছে "বৃষা পৃথিব্যা অয়ম্ বৃষা বিশ্বস্য ভূতস্য ককুন-মনুষ্যানাম্ একবৃষো ভব"। অর্থাৎ রাজা সমগ্র পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর অধিকারী। তিনি মানবসমাজের অধিপতি। এই ধরনের অনুষ্ঠান ও শ্লোকরচনার মাধ্যমে রাজাধিকারের পরিধি প্রসারিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে এই রাজার নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংগঠনের বিকাশ পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সংগঠনের পূর্বাভাস দেয়।

## ২খ.৯ অনুশীলনী

১। ঋগ্বৈদিক যুগের আর্থ-সামাজিক জীবনের বিবরণ দিন।

২। পরবর্তী বৈদিক সমাজের পরিবর্তনের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে নারীর ভূমিকায় কী রূপান্তর ঘটেছিল?

৩। ঋগ্বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪। পরবর্তী বৈদিক সমাজে অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্রটি আলোচনা করুন।

৫। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আরব্ধ উপজাতীয় সমাজ থেকে রাষ্ট্রসমাজের বিবর্তনের ধারাটি ব্যাখ্যা করুন।

৬। বৈদিক সাহিত্যে রাজতন্ত্রের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচিত তত্ত্বের বিবরণ দিন।

৭। বৈদিক 'সভা' ও 'সমিতিক্ষ' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।

## ২খ.১০ গ্রন্থপঞ্জী


১। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ *ইতিহাসের আলোকে আর্য সমস্যা (১৯৯৫)*

২। পিটার গাইলস ঃ *দ্য এরিয়ানস্, কেমব্রিজ হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়া, ভলিউম-১ (১৯২২)*

৩। ও. শ্রোভার ঃ *দ্য প্রিহিস্টরিক অ্যান্টিকুইটিস অফ দ্যা এরিয়ান পিপল, বাই জেভন্স্ (অনুদিত) (১৮৯৮)*

৪। মর্টিমার হুইলার ঃ *দ্য ইন্ডাস সিভিলাইজেশন সাপ্লিমেন্ট টু, দ্য কেমব্রিজ হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়া (১৯৬০)*

৫। ডি.ডি. কোশাম্বী ঃ *এ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য স্টডি অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী (১৯৯১)*

৬। কে. মিনাক্ষী ঃ *"লিঙ্গুয়িস্টিক এ্যান্ড দ্য স্টাডি অফ আর্লি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী", রিসেন্ট পার্সপেক্টিভ্স অফ আর্লি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রী,* রোমিলা থাপার (সম্পা.) *ফ্রম লিনিয়েজ টু স্টেট*

৭। রোমিলা থাপার ঃ *ফ্রম লিনেজ টু স্টেট (১৯৯০)*

৮। অবিনাশ চন্দ্র দাস ঃ *রিগ্ ভেদিক্ কালচার (১৯২৫)*

৯। সুকুমারী ভট্টাচার্য ঃ *বৈদিক সমাজে নারীর স্থান, প্রাচীন ভারতে সমাজ ও সাহিত্য (১৩৯৪)*

১০। এ. এস. অলটেকার ঃ *দ্য পোজিশান অফ উম্যান ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন (১৯৫৯)*
*স্টেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৭২)*
*জার্নাল অফ্ দি নিউমিসম্যাটিক্ সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া, পঞ্চদশ খণ্ড*
*ভেদিক ইনডেক্স, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৮)*

১১। এ. এ. ম্যাকডোনেল ও এ. বি. কেটে ঃ *ভেদিক ইনডেক্স অফ নেমস এ্যান্ড সাবজেক্টস দ্বিতীয় খণ্ড ২*

১২। জে. এম. কেনোয়ার (সম্পা.) ঃ *ওল্ড প্রবলেমস্ অ্যাণ্ড নিউ পার্সপেক্টিভস্ ইন দ্যা আর্কিওলজি অফ্ সাউথ এশিয়া*

১৩। এ. পারপোলা ঃ *দ্যা কামিং অফ্ দি এরিয়ানস্*

১৪। এ. ঘোষ (সম্পা.) ঃ *এনসাইক্লোপিডিয়া অফ্ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি*

১৫। ডি. পি. আগরওয়াল ঃ *দ্য আর্কিওলজি অফ ইন্ডিয়া (১৯৮২)*

১৬। রণবীর চক্রবর্তী ঃ *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (১৩৯৮)*

১৭। ডি. এ. স্মিথ ঃ *আর্লি হিস্ট্রী অফ ইন্ডিয়া (১৯৪২)*

১৮। ই. ডব্লিউ. হপকিনস ঃ *ইন্ডিয়া ওল্ড এ্যান্ড নিউ (১৯০১)*

১৯। এস. ভুলার (সম্পা) ঃ *স্যাক্রেড বুক্স অফ দ্য ইস্ট, খণ্ড ২৪*

২০। কে. পি জয়সোয়াল ঃ হিন্দু পলিটি (১৯৪৩)

২১। আর. কে. মুখার্জী ঃ হিন্দু সিভিলাইজেশন (১৯৬৩)

২২। হরিপদ চক্রবর্তী ঃ *ভেদিক ইন্ডিয়া, পলিটিক্যাল এ্যান্ড লিগ্যাল ইনস্টিটিউশন ইন বেদিক লিটারেচার (১৯৮১)*

২৩। এ. ম্যাকডোনাল ঃ *এ হিস্ট্রী অফ সানস্ক্রিট লিটারেচার (১৯৫২)*

২৪। ইউ. এন. ঘোষাল ঃ *হিন্দু পলিটিক্যাল থিওরিস (১৯২৭)*

২৫। পি. ডি. কানে ঃ *হিস্ট্রীস অফ্ ধর্মশাস্ত্র (১৯৩০-৪৬)*

# একক ২গ ❑ বৈদিক যুগের ধর্ম-চেতনা, বিশ্বাস ও প্রক্রিয়া

*গঠন*

২গ.০ উদ্দেশ্য

২গ.১ বৈদিক সাহিত্যে দেবদেবী

২গ.২ ব্রাহ্মণ ও বিত্তবানের প্রাধান্য

২গ.৩ ধর্ম দর্শন

২গ.৪ অনুশীলনী

২গ.৫ গ্রন্থপঞ্জী

## ২গ.০ উদ্দেশ্য

বৈদিক সাহিত্যে দেবদেবী, ধর্ম-চেতনা, বিশ্বাস ইত্যাদি ব্রাহ্মণ ও বিত্তবানদের প্রাধান্য সম্বন্ধে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

## ২গ.১ বৈদিক সাহিত্যে দেবদেবী

বৈদিক সাহিত্যে যে বিষয়টি সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল ধর্ম। সংহিতা-সাহিত্যগুলি মুখ্যত দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও প্রার্থনার সংকলন। *ঋগ্বেদ সংহিতা*-এ মূলতঃ তিন প্রকার রচনা বিষয় পাওয়া যায় ঃ দেবতার রূপবর্ণনা, দেবতার আপ্যায়ন ও প্রার্থনা। *যজুর্বেদ সংহিতা* ও *ব্রাহ্মণ সাহিত্যে* যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও নির্দেশমালা পাওয়া যায়। কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত *অথর্ববেদ সংহিতা*-এ সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণ সাধনের উপযোগী অনুষ্ঠান এবং শত্রু বিনাশের জন্য অনুষ্ঠানের বর্ণনা ও প্রক্রিয়া নির্দেশিত হয়েছে। বৈদিক সমাজ বা রাজনীতি সংক্রান্ত তথ্য বৈদিক সাহিত্য থেকে আরম্ভ হলেও প্রধানত ধর্ম-বিষয়ক ভাবনারই প্রতিফলন এই সাহিত্যে রয়েছে। আর্যভাষীদের এই ধর্মবিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছিল। বিবিধ ধর্ম চিন্তা, আদিম বিশ্বাস, দেব-রূপকল্প—এমনকী, যাদু ও ঐন্দ্রজালিক বা অতিপ্রাকৃত অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস ইত্যাদির পরিচয়ও এই ধর্ম ভাবনায় মেলে যার মধ্যে থেকে বৈদিক অধ্যাত্ম চিন্তা ধীরে ধীরে পরিণত লাভ করেছে।

আর্যেরা প্রধানত সর্বেশ্বরবাদী ছিলেন। *ঋগ্বেদ*-এ ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র বা সবিতৃ, পূষণ, অগ্নি, সোম, রুদ্র, অশ্বিনীদ্বয় ও মরুদ্‌গণ ইত্যাদি দেবতার বর্ণনা রয়েছে। পুরুষপ্রধান বৈদিক ধর্মে বিশেষ কয়েকটি দেবরূপেরও উপস্থাপনা করা হয়েছে, যথা পৃথিবী, অদিতি, ঊষা, রাত্রি, নির্ঋিতি, গায়ত্রী, যমী, বাক্, সরস্বতী ইত্যাদি। বৈদিক দেবীরা অবশ্য দেবতাদের তুলনায় গৌণ ছিলেন।

ধর্মীয় বিশ্বাসের আদিমতম রূপটি *ঋগ্বেদ*-এ প্রাপ্ত। এই ধর্ম-চেতনায় ও দেবরূপকল্পে প্রকৃতি-পূজার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্র পর্জন্য বলে অভিহিত। বজ্র তাঁর অস্ত্র এবং তিনি বৃষ্টিপাত ঘটান। পূষণ্ বা সবিতৃ পৃথিবী আলোকিত

করে পথ দেখান। মরুদ্‌গণ সদা সঞ্চরমাণ বায়ু, রুদ্রের সহচর। সরস্বতীর কল্পনায় প্রাণদায়িনী নদীরূপে সূচিত এবং পরে দেবীরূপে পরিণত। এই প্রকৃতি-পূজার স্তর থেকে ক্রমশ অতিলৌকিক ঐশী শক্তির কল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল। সমস্ত আদি ধর্মবিশ্বাসের মূলে আকাশ ও স্বর্গলোকের একটি দৈবী রূপ ও উৎপত্তি কল্পনা করা হয়। *ঋগ্বেদ*-এর 'দ্যৌ বা 'দ্যায়ুস্' প্রথম অন্তরীক্ষের দেবতারূপে কল্পিত হয়েছেন। তার পরে অনাদি আকাশের দেবতা বরুণের রূপ সৃষ্ট হয়েছে। বরুণ এবং মিত্র'র কল্পনায় পুরাতন ইন্দো-ইরাণীয় সংস্কৃতির ছায়া লক্ষ্য করা যায়। ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ *আবেস্তা*-এ বর্ণিত আহুরা-মাজ্‌দা'র অপর নাম—'বরণ'। 'বোখাজ-কোঈ লেখ'-তেও এই দেবতার উল্লেখ রয়েছে। মিত্র'র দৈবী রূপটিও ইরাণীয় সংস্কৃতির সাথে জড়িত। *ঋগ্বেদ*-এর বরুণ দেবতাদের সম্রাট। তিনি উজ্জ্বল সুবর্ণ বেশ পরিধান করেন এবং সমস্ত রাষ্ট্রের অধিপতি। বরুণ নীতিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন। তাঁর বহু চক্ষু, তাই তিনি 'উরুচক্ষস্'। এর সঙ্গেই জড়িত সর্বোচ্চ ধর্মযাজকরূপে বরুণের কল্পনা। বৈদিক সমাজে রাজশক্তির উত্থানে রাজার ধর্মযাজকরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার বরুণের কল্পনা থেকে উদ্ভূত।

রাজশক্তির অপর দিকটি, অর্থাৎ যুদ্ধবৃত্তির দিকটি 'ইন্দ্র' কল্পনায় পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ*-এ সমগ্র দেবতার মধ্যে সর্বপ্রধান ও জনপ্রিয় দেবতা ইন্দ্র। সব থেকে বেশি উল্লিখিত এই ইন্দ্রের স্বরূপটি মানবসত্তার সঙ্গে জড়িত। তিনি সুগঠিত মুখায়বসম্পন্ন প্রকল্প শক্তিমান মানবরূপে বর্ণিত। তিনি সাহসী এবং দিব্যকান্তি। তিনি শক্তিশালী অশ্ববাহিত যানে চলাফেরা করেন। তিনি শত্রুর গাভী জয় করে এনে তার উপাসকদের দান করেন। তিনিই সমস্ত পৃথিবীর খাদ্য পূর্ণ করেছেন। ইন্দ্র রাজা সুদসকে দাশরাজের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। বরুণ এ কার্যে তাঁকে সহায়তা করেছেন। সার্বভৌমত্বের প্রতীক বরুণ ও যুদ্ধ ও শক্তির দেবতা ইন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই বৈদিক সমাজে প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইন্দ্রের বর্ণনায় ঋগ্বৈদিক আর্যদের যুদ্ধের কার্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু চিত্র পাওয়া যায়। আর্যভাষী কৌম বা গোষ্ঠীদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ইন্দ্র প্রায়শই পূজিত হচ্ছেন যুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য। শুধু রাজা সুদাস নয়, ইন্দ্র নামি'কেও রক্ষা করেছেন নামুচি দানবের হাত থেকে। তিনি একশত নগরী জয় করেছেন। ইন্দ্র দ্যোতনের পক্ষে যুদ্ধ করে বেতসু দশোনি, তুগ্র, ইভ এবং তুতুজিকে বশ করেছেন। ধুনি যে জলের প্রবাহ রোধ করেছিলেন ইন্দ্র তা মুক্ত করেছেন এবং তুর্বশ ও যদু সম্পর্কে সমুদ্র পার হতে সাহায্য করেছেন। ইন্দ্রর যুদ্ধ-বৃত্তির পটভূমিটি ঐতিহাসিক বলে ধরে নেওয়া যায়। এই বর্ণনাগুলিতে ঋগ্বৈদিক আর্যগোষ্ঠীরও কিছু কিছু নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া, প্রাগার্য হরপ্পীয় সভ্যতার কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে। যেমন, একস্থানে বর্ণনা রয়েছে ইন্দ্র যখন বরশিখ নামক অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যাত্রা করে বৃচীবৎকে হত্যা করেছিলেন তখন তাঁর বজ্রের দারুণ নির্ঘোষে হরিয়ূপীয়া নগরীর অপর প্রান্তে বরশিখের এক পুত্রের মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিকগণ এই হরিয়ূপীয়া নগরীটিকে হরপ্পা নগরীরূপে চিহ্নিত করেন। ইন্দ্রর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল অসুর নিধন এবং এ ক্ষেত্রে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে। শুষ্ম ও পিপ্রু নামক অসুরদের ইন্দ্র মায়াজালে হত্যা করেছিলেন। *ঋগ্বেদ*-এ বহুবার বলা হয়েছে, ইন্দ্র অহিকে বধ করে জলের ধারা বা সপ্তনদী মুক্ত করেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে 'অহি' একটি সর্পরূপ এবং ঋগ্বৈদিক সাহিত্যে অহি'র অর্থ সম্ভবত বাঁধ বা পাশ। ইন্দ্র এই পাশ বা বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। সম্ভবত অহি বা বৃত্র নামে উল্লিখিত অহি এবং বৃত্র আসলে হরপ্পীয় যুগে নির্মিত জলবাঁধ। ডি ডি কোশাম্বীর মতে ইন্দ্র যে বৃত্রের কবল থেকে নদীগুলিকে মুক্ত করেছিলেন সেই বৃত্রের যথার্থ অর্থ বাঁধ। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত হয়েছে—যখন বৃত্রকে ইন্দ্র বজ্রাঘাত করলেন তখন

ধরিত্রী কেঁপে উঠল, রথের চাকার ন্যায় ক্ষিপ্র গতিতে পাথর ভেঙে গড়িয়ে পড়ল এবং বৃত্রাসুরের ভূপাতিত নিষ্প্রাণ দেহের উপর দিয়ে জলের ধারা বয়ে গেল। এই বর্ণনায় একটি বাঁধ ভেঙে পড়ার ছবি পাওয়া যায়। এইভাবে ইন্দ্রর রূপকল্পে দেখা যাচ্ছে মানবশক্তি ও ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের সমন্বয়। ঋগ্বৈদিক যুগে, যখন আর্যরা নিরন্তর তাঁদের আর্থসামাজিক ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন, তখন ইন্দ্রর মতো একটি দৈবী মানবের কল্পনার প্রয়োজন ছিল আত্মবিশ্বাস গঠনের জন্য।

*ঋগ্বেদ*-এর অপর মুখ্য দেবতা অগ্নি। আর্য-গার্হস্থ্যজীবনের কেন্দ্রে অগ্নির অবস্থান। তিনি গৃহদেবতা প্রাগ্‌ঋগ্বৈদিক যুগের আভাস পাওয়া যায় *ঋগ্বেদ*-এর আপ্রীসূক্তে। অগ্নিকে এখানে বিভিন্ন নামে ও ভূমিকায় আহ্বান করা হয়েছে। যেমন—*ঋগ্বেদ*-এর প্রথম মণ্ডলে অগ্নিকে বার্তাবাহী, পথপ্রদর্শক ও সমস্ত সম্পদের অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অগ্নিকে এখানে 'নরাশংস' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আরেকটি অভিধা পাওয়া যায়—'তনূনপাৎ'। 'তনূনপাৎ' রূপে অগ্নি সোমরসকে পবিত্র করেন। জাজ্বল্যমান অগ্নির উজ্জ্বল সুন্দর রূপের বর্ণনা রয়েছে *ঋগ্বেদ*-এর আপ্রীসূক্তে। অগ্নি এখানে অতন্দ্র ও দীপ্যমান প্রহরী। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে আদিম যুগের মানুষের জীবনে আগুনের ব্যবহার যে নিরাপত্তা ও সুবিধা দিয়েছিল যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছিল মানব সমাজে। *ঋগ্বেদ*--এর এই অংশগুলিতে অগ্নির আরাধনায় আদি মানুষের বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও নির্ভরতাই প্রকাশিত। পরবর্তী বৈদিক ধর্মভাবনায় অগ্নির ভূমিকা যজ্ঞাগ্নির মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছিল। *ঋগ্বেদ*-এর অন্য অংশেও অগ্নির উল্লেখ বারংবার হয়েছে। তিনি সূর্যাকে অশ্বিনীদ্বয়ের হাতে কন্যাদান করেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অগ্নি বরুণ ও যমের সঙ্গে একসাথে উল্লিখিত। সোম হলেন অপর দেবতা যিনি *ঋগ্বেদ*-এ অগ্নির মতো মাহাত্ম্যশালী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ধর্মীয় ভাবনার সোমদেবরূপে গৌণ, যদিও সোমযজ্ঞের মাহাত্ম্য তখনো বর্তমান। *ঋগ্বেদ*-এর সমগ্র নবম মণ্ডল সোমদেবতার প্রতি নিবেদিত। সোমদেবতার রূপকল্প সোমরসও তার মাদক শক্তি থেকে উৎপন্ন। এই পানীয়ের উত্তেজক ও বলবর্ধক শক্তি ঋগ্বৈদিক মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় ছিল। দীর্ঘায়ু লাভের জন্যও এই পানীয় ব্যবহার করা হত। এই ভাবনায় ইরাণীয় ও ব্যাবিলনীয় কিংবদন্তীর ছায়া রয়েছে। আবেস্তায় 'হওম' পানীয় ও ব্যাবিলনীয় প্রত্নকথার দীর্ঘায়ুপ্রদ যাদুলতা সোমরসের সঙ্গে তুলনীয়।

সবক্ষেত্রেই ঐন্দ্রজালিক বা দৈব শক্তির উল্লেখ রয়েছে। সোমলতা থেকে নিষ্কাশিত রসের সঙ্গে দুগ্ধজাত দ্রব্য, মধু, যবচূর্ণ ইত্যাদি মিশিয়ে তার মাদকতা-শক্তিকে বর্ধিত করা হত। সোমরস আনুষ্ঠানিক ভাবে যজ্ঞের মাধ্যমে প্রস্তুত হত এবং এই যজ্ঞ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঋগ্বৈদিক জীবনে। এর সঙ্গে ইন্দ্রজাল ও রহস্যের সংযোজন ঘটলে এই উদ্ভিজ্জ পানীয়টি দৈব্য সত্তায় পরিণত হল—'সোমদেব', 'রাজা', 'সম্রাট' ইত্যাদি রূপে।

সোম সর্বস্তর অধিকারী এবং সর্বজতের রাজা। সোমরসের বলবর্ধক ক্ষমতা সম্বন্ধে নবম মণ্ডলে বলা হয়েছে—বৃত্ত সংহারে উদ্যত ইন্দরকে সোম পানীয় প্রদান করেছেন। প্রার্থনা করা হয়েছে, রাজকুমার ও রাজন্যবর্গের সবাই যেন এই উজ্জ্বলবর্ণ, শক্তিবর্ধক পানীয় সোমদেবকে অর্জন করেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেও দেখা যায় সোমযজ্ঞের গুরুত্ব একই ধারায় বর্তমান। সোমযাগ দীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষ ধরে অনুষ্ঠিত হত। অবশ্য সোমরস প্রস্তুত এবং পান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সোমকে বারবার অতিথি ও রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে সোমযাগের জনপ্রিয়তা সম্ভবত হ্রাস পেয়েছিল এর পরবর্তী কালে।

সৌর দেবতাদের মধ্যে বহু কল্পরূপ ও নাম পাওয়া যায় যা একে অপরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সূর্যের কথা *ঋগ্বেদ*-এ রয়েছে। তিনি হিরণ্য বর্ণ এবং সুবর্ণরথে চলাচল করেন। তিনি আকাশকে ধারণ করে আছেন। সবিতৃর রূপকল্পটি সূর্যের মতোই হিরণ্য-বর্ণ। তবে সূর্যের রূপসৃষ্টিতে প্রাকৃতিক শক্তির যে বস্তুমুখী আভাস রয়েছে, সবিতৃর কল্পনায় তা ভাবনার স্তরে উপনীত। সবিতৃ সুবর্ণ-বাহু ও সুবর্ণ-চক্ষুবিশিষ্ট। তিনি সর্বোচ্চ স্বর্গলোকের অধীশ্বর। তাঁর উপাসক ভক্তগণ এই উচ্চলোকের অধিবাসী হবেন। তিনি প্রশস্ত-বাহু। তাঁর বেশভূষা পীতবর্ণের। তিনি ক্ষিপ্র, রোহিত অশ্ববাহী সুবর্ণরথে চলাচল করেন। তিনি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে সকল জীবের কল্যাণ সাধন করেন। তিনি বাহু প্রসারিত করে নদীগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট পথে বাহিত করেন। জীর্ণ প্রাণকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গৌণ দেবতা মিত্র, ভগ, দক্ষ, অর্যমা, পূষা বা পূষণ ও বিষ্ণু। এর মধ্যে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য পরবর্তী সাহিত্যে বৃদ্ধি পায় এবং পূষা/পূষণ ও মিত্র অবলুপ্ত হন। ভগ *ঋগ্বেদ*-এ ও *মৈত্রায়ণী সংহিতা*-এ উল্লিখিত। দক্ষের কল্পনায় সৃষ্টিকর্তারূপী সূর্যের প্রভাব পাওয়া যায়। মার্তণ্ড, বিবস্বৎ ও অর্যমন আদি সৃষ্টিকর্তা আদিত্য রূপে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত। তবে সৌরমণ্ডলের দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুর ভূমিকা *ঋগ্বেদ*-এ নিতান্তই গৌণ। সমগ্র *ঋগ্বেদ*-এ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত মাত্র তিনটি শ্লোক পাওয়া যায়। তবে লক্ষণীয় যে, বিষ্ণুর মধ্যে সূর্যের ত্রিবিধ গতির প্রকাশ ঘটেছে বলে *ঋগ্বেদ*-এ চিন্তা করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তা ছাড়া, বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপের বর্ণনা *ঋগ্বেদ*-এ বারংবার পাওয়া যায়। তবে বিষ্ণুর বামনাবতারের রূপটি *ঋগ্বেদ*-এ পাওয়া যায় না। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ বামনরূপী বিষ্ণুর কল্পনায় অনার্য বিশ্বাসের ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া, বিষ্ণুর বরাহ রূপটিও *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ রয়েছে। মীনরূপটি প্রথমে *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিষ্ণুর সঙ্গে এর সরাসরি সংযোগ ঘটেনি। বিষ্ণুর রূপটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করেছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে আর্য ও অনার্য উপজাতিগুলির মিশ্রণের ফলবশত ধর্মবিশ্বাসের আদানপ্রদানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ও *ব্রাহ্মণ*-এ বারংবার বিষ্ণুকে যজ্ঞের অধিষ্ঠিত দেবতারূপে অভিহিত করা হয়েছে। যজ্ঞ-বিষ্ণু-রূপটি *জৈমিনী ব্রাহ্মণ*-এ পাওয়া যায়।

অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব রুদ্রের কল্পনাতেও রয়েছে। তাম্রবর্ণ, কপর্দিন বা জটাধারী, সুগঠিত চোয়াল-বিশিষ্ট রুদ্র বহুরূপ ধারণ করেন। তিনি শক্তিশালী ও ভয়ানক। *ঋগ্বেদ*-এর রুদ্র দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের রক্ষা করেন। তিনি গবাদিপশু, নারী ও পুরুষের রক্ষাকর্তা। *ঋগ্বেদ*-এর বেশিরভাগ শ্লোকেই তাঁকে গবাদি পশুর দেবতারূপে দেখানো হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রুদ্রের রুদ্ররূপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি রোহিত বা কপিলবর্ণ, নীলকণ্ঠ, সহস্রাক্ষ এবং হিরণ্যবাহু। তিনি ব্যোমকেশ, বামন এবং বৃদ্ধ বলেও বর্ণিত।

গবাদি পশুর দেবতারূপে রুদ্র পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত। গবাদি পশুর মঙ্গলসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত নাভানেদিষ্ঠ যজ্ঞের গ্রহীতারূপে রুদ্রের আবির্ভাব, *তৈত্তিরীয় সংহিতা* এবং *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* রুদ্র পূজার প্রচলনকে নির্দেশ করে। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*-এ রুদ্রকে অগ্নি শিবকৃত বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই রূপ ধারণে রুদ্র গবাদি পশুর হিতসাধনে নয়, অমঙ্গল করেন। *ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ*-এ তাই তাঁর প্রতি প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে তিনি যজমানের পশুদের বিনষ্ট না করেন। *ঋগ্বেদ*-এর হিতকারী রুদ্র পরবর্তী *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে বিধ্বংসীরূপে পরিবেশিত। *তৈত্তিরীয় সংহিতা*-এ তিনি অগ্নিরূপে বর্ণিত, তাঁর ত্রিমুখী অস্ত্র এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় তিনি ভয়ঙ্কর। রুদ্রের সঙ্গে শিবের সংযোজনও ঘটে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। এর ফলে—যে রুদ্র *ঋগ্বেদ*-এ একটি গৌণ

ভূমিকায় ছিলেন তিনি রুদ্র-শিব যুগ্মরূপে মহাকাল, তিনি রুদ্র ও ঈশানরূপেও উত্তর-পূর্ব কোণের অধিপতি এবং যমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মৃত্যুর দেবতারূপেও স্থান অধিকাল করেছেন। রুদ্র-শিবের বর্ণনায় বহুল পরিমাণে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক সাহিত্যে যে সব দেবীর কল্পনা পাওয়া যায় তার বেশিরভাগই কোনো দেবতার সঙ্গে যুগ্মভাবে উপস্থাপিত। যেমন—সবথেকে প্রাচীন দেবী মাতা পৃথিবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি পিতা দ্যৌ অর্থাৎ আকাশের দেবতার সাথে সংযুক্ত। দেবতাদের তুলনায় দেবীর ভূমিকা বৈদিক ধর্মে গৌণ। সকল দেবতা যা থেকে জাত সেই দেবমাতা অদিতি'র উপস্থাপনা প্রয়োজনীয় ছিল; কারণ জন্মগ্রহণের রহস্যটি মাতার উপস্থিতি ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু দেবসন্তানের জন্মদাত্রী ছাড়া দেবীরূপে অদিতির কোনো বিশেষ ভূমিকা নির্ধারিত নেই বৈদিক সাহিত্যে। যেটুকু পরিচয় রয়েছে তা ঋগ্বেদ-এ প্রাপ্ত। *ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত অদিতি মানুষকে আনন্দ, সুখসমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু দান করেন। কিন্তু আদিত্যদের মাতারূপে অদিতি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অনুপস্থিত।

*ঋগ্বেদ*-এ বর্ণিত ঊষা দেবীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন। কুড়িটি শ্লোকে ঊষার উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে। তিনি কখনো সম্পূর্ণ একা এবং কখনো অশ্বিনীদ্বয়ের সঙ্গে এক সঙ্গে উপস্থাপিত, তিনি আকাশের কন্যা, সুন্দরী যুবতী যিনি—সমস্ত পৃথিবী আলোকিত করেন, মানবজগতের নিদ্রা মোচন করে খাদ্য ও সম্পদ দান করেন। তিনি বৃদ্ধাও বটে অথচ চিরনবীনা। তিনি স্বসর অর্থাৎ সূর্যের কন্যা,স্ত্রী বা ভগ্নীরূপে বিভিন্ন শ্লোকে বর্ণিত। তবে উষার উপস্থাপনা সর্বদাই কোন দেবতার কন্যা, প্রিয়া বা বধূরূপেই হয়েছে। কুমারী রূপটিই *ঋগ্বেদ*-এ সবথেকে বেশি প্রদর্শিত। সৌরমণ্ডলের অপর দেবী সূর্যা গৌণ। মাত্র কয়েকটি শ্লোকেই তাঁর উল্লেখ রয়েছে। তিনি সূর্যের পুত্রী এবং সোমকে তিনি তাঁর নিজের কেশ দিয়ে পবিত্র করেন। পরবর্তী কালে অশ্বিনীদ্বয়ের সূর্যাকে রথচালনায় জয় করার কাহিনীটি *কৌষাতকি ব্রাহ্মণ*-এ উপস্থিত। এখানে দেবী-মাহাত্ম্যের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

অপরদিকে, সরস্বতী রূপকল্পটি নদী থেকে দেবীতে পরিণত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। *ঋগ্বেদ*-এ নদীরূপে তিনি ইরা, ভারতী, হোত্রা, বরূত্রি ও ধিষণার সঙ্গে পূজিত হয়েছেন। সম্ভবত ব্যাধিনিয়ামক শক্তির জন্য সরস্বতীকেও অশ্বিনীদ্বয়ের সঙ্গে প্রশংসা করা হয়েছে। *অথর্ববেদ*-এও তাঁকে শিশুদের রোগ নিরাময় করতে দেখা যায়। তবে নদীরূপে তিনি সমৃদ্ধি, সন্তান ও শক্তিদান করেন। তাঁর উপাসকদের তিনি শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি সর্বপ্রধানা নদী, দেবী ও মাতা। তবুও তিনি বিদ্যুতের কন্যা (পাবিরবি কন্যা) ও বীর পত্নীরূপে উপস্থাপিত। এ ছাড়া, সরস্বতীর স্বামীরূপে সারস্বত নামক এক নতুন দেবতার সৃষ্টি বৈদিক ধর্মে তথা সমাজে পুরুষ প্রাধান্যের দিকটি তুলে ধরেছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতীকে বেদমাতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঠিক এই অভিধা বাক্‌দেবীর ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছে *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ মানবী সত্তা থেকে দেবীতে রূপান্তরিত। বাক্ অর্থাৎ মুখোদ্‌গত বা মুখনিঃসৃত বাক্য ও চিন্তার অধীশ্বর। *ঋগ্বেদ*-এর পরবর্তী অংশ দশম মণ্ডলেই তাঁর যথার্থ মহিমা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি তাঁর নিজের গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছেন—রুদ্র, বসু, আদিত্য ও বিশ্বে দেবগণের সঙ্গে তিনি সহাবস্থান করেন। তিনি মিত্র (সূর্য) ও বরুণ (সমুদ্র), ইন্দ্র (আকাশী), অগ্নি এবং অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করে আছেন। তিনি অধীশ্বরী, তিনি সম্পদ দান করেন। তিনি জ্ঞানের অধিকারিণী এবং তিনিই জ্ঞান বিতরণ করেন। তিনি দেব এবং মানব দুইয়ের দ্বারাই পূজিত। তিনি ব্রাহ্মণ, ঋষি

ও গুণশালী ব্যক্তি—সকল মানুষকেই অপরিসীম শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি রুদ্রের ধনুকে ছিলা প্রসারিত করে তাঁকে শত্রু দমনে সহায়তা করেন। তিনিই বায়ুর ন্যায় শ্বাস প্রক্রিয়ায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে গতিশীল করে তোলেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই অসামান্য শক্তিশালী দেবীর সঙ্গে রূপকল্পে যুক্ত হন সরস্বতী। *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ বহুবার সরস্বতী ও বাক্-সত্তারূপে পরিবেশিত—"সরস্বীত্য পিন্বস্বেতিঃ বাগ্বৈ সরস্বতী"—অর্থাৎ সরস্বতীতে বহমানা হও, সরস্বতী নিশ্চিতরূপেই বাক্। *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ*-এও বাক্ অবিনশ্বর সকল অনুষ্ঠানের অগ্রজা, বেদমাতা এবং অমৃত্যুর কেন্দ্রবিন্দুরূপে বর্ণিত। *যজুর্বেদ*-এও সরস্বতী ও বাক্‌দেবীকে অভিন্নরূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু শক্তির মাহাত্ম্যে ও জনপ্রিয়তায় বাক্‌দেবী বা সরস্বতী, ঊষা বা অদিতির মতোই পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে উত্থিত রুদ্র বা বিষ্ণুর তুলনায় গৌণ। তবুও তুলনামূলকভাবে ঋগ্বৈদিক সমাজ থেকে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বিশেষত *ব্রাহ্মণ্য* গুলিতে, দেবী ও মাতৃপূজার উপস্থাপনা অনেক বেশি লক্ষণীয়। *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে নির্ঋাতি, শচী, যমী, অম্বিকা, রুদ্রাণী, শ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতীর মাতৃদেবীরূপে পুনরাবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে এই ধারাটি অনার্য সংস্কৃতির প্রভাবের ফসল। দেবী কল্পনায়, বিশেষ করে নিঋতির অন্ধকার রূপটি দেবী মাতৃকার নেতিবাচক ভূমিকাটি তুলে ধরে। নির্ঋতি পৃথিবীর দেবী। তিনি ধ্বংস করেন, তিনি যন্ত্রণাও দেন এবং মানুষকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যান। তবে এই শক্তিশালী রূপটি থেকে পরবর্তী বৈদিক সমাজে বাস্তব ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করলে ভুল হবে। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মাতৃদেবীদের এই সংযোজন দেবতাদের সঙ্গিনী ও সহধর্মিণীরূপেই। এর দ্বারা দৈবী শক্তি ও বিশ্বাসকে জনপ্রিয়তার স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। আর্য-অনার্য সমাজে সংস্কৃতির মানুষজনের ক্রমবর্ধমান আগমন ও সংযোজনের ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসের এই সমন্বয় ও পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

## ২গ.২ ব্রাহ্মণ ও বিত্তবানের প্রাধান্য

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির নিরন্তন সমন্বয় ও সংশ্লেষণের চিত্রটি পরিষ্কার। উন্নত কৃষিকার্য ও শিল্পের ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদ ও জনসংখ্যা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। সমাজে সম্পদশালী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে ও শ্রেণী-বিভাজন প্রকট হয়ে ওঠে। শ্রমবিভাজন এই সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে। কৃষিকার্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শ্রমদানের ভার বৈশ্য ও শূদ্রের উপর ন্যস্ত হল। অল্পসংখ্যক কিছু ব্যক্তি উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। এঁরাই রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেন। সমাজের বিত্তশালী, ক্ষমতাবান মানুষেরা যাগযজ্ঞাদি ব্যয়সাপেক্ষ অনুষ্ঠানের সম্পাদনে অংশগ্রহণ করেন। যাগযজ্ঞাদির বাহুল্য ও আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়, দক্ষিণার গুরুত্ব বাড়তে থাকে এবং পুরোহিত-শ্রেণীর ক্রমিক উত্থান ঘটে। সমাজে আধ্যাত্মিক অভিভাবকরূপে এই সম্প্রদায় সমস্ত মানুষের উপর কর্তৃত্ব করতে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও যজ্ঞানুষ্ঠানগুলিকেও—এই কর্তৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সুনিয়ন্ত্রিত, সুনির্দিষ্ট ও জটিল করে তোলা হয়। বেদ ও শস্ত্রচর্চা প্রধানত ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় তাঁদের এই কর্তৃত্ব বজায় থাকে। সমাজের অপরদিকে, রাজনৈতিক শক্তির উত্থানেও ব্রাহ্মণ-বর্ণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

উঠেছিল। *যজুর্বেদ*-এ বর্ণিত অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং *অথর্ববেদ*-এ অভিষেক ও যুদ্ধাভিযান বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলি, সমাজে রাজশক্তির প্রতিষ্ঠালাভের পিছনে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত-সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক সহায়তাদানের দিকটি সুস্পষ্ট করে তোলে। এই অনুষ্ঠানগুলি জটিলতর, ব্যাপকতর ও গূঢ় অর্থবহ হয়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে। সহজবোধ্য না হওয়ার ফলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সাধারণের কাছে রহস্যময় হয়ে ওঠে এবং এগুলি আধিদৈবিক ও ঐন্দ্রজালিক মাত্রা পায়। এর ফলে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতীকি দিকটি সহজেই সমাজের সাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ব্যবহার করতে সমর্থ হন। এর সাথে আর এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয় অথর্ববেদে। এই সংহিতার বিভিন্ন সূত্রগুলি—সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণ সাধনের উপযোগী অনুষ্ঠানের নিয়মাবলী ও গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করেছে। এর মধ্যে ব্যাধি নিরাময়, পারিবারিক শান্তি বৃদ্ধি ও গূঢ়বিদ্যাসংক্রান্ত সূক্তগুলিতে ইন্দ্রজাল ও ধর্মের অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা, রক্ষাকবচ, প্রলেপ, মায়াজ্ঞান ইত্যাদির ব্যবহার, যাদুর প্রচলন সূচিত করে। শত্রুকে পরাস্ত করার জন্যও ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এই যাদুর ব্যবহার পুরোহিতবর্গের ক্ষমতা আরও বর্ধিত করে। সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চ শ্রেণী থেকে দরিদ্র, সমস্ত স্তরেই নির্বিশেষে এই স্তরনির্বিশেষে এই যাদু-প্রক্রিয়া ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, বিধিমত যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করলে মানুষ প্রকৃতি ও দেবতার দাক্ষিণ্য লাভ করবে। দেবতা এবং যজ্ঞাদি ও তৎসহ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। বৈদিক ধর্ম-ভাবনার পরিণতি লক্ষ্য করা যায় এই সাহিত্যে। উল্লেখযোগ্য যে, 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি 'ব্রহ্মণ' শব্দ থেকে জাত, যার অর্থ হল গূঢ়শক্তিসম্পন্ন শব্দ। মনে করা হত যে, এজাতীয় শব্দে ঐশী ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা রয়েছে। এই শব্দ উচ্চারণে আরোগ্যলাভ ঘটে, শক্তিবৃদ্ধি হয় ও এগুলির দ্বারা সাধারণ ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুলি যিনি উচ্চারণ করবেন তাঁকে বলা হত 'ব্রহ্ম'। প্রধানত প্রবীণ ও সম্মানিত শিক্ষকদের দ্বারাই এগুলি উচ্চারিত হত এবং এঁদের দৈব ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা হত। এই ব্রাহ্মণগুলির অন্তর্গত ছিল দেবকাহিনী। বিভিন্ন পুরোহিত পরিবার, বংশ-পরম্পরায়, ধারাবাহিক ভাবে, পূর্বকথিত কাহিনী প্রাজ্ঞোক্তি, নীতিজ্ঞান, আপ্তবাক্য এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-নির্দেশাবলী, যজ্ঞাদির ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সংগ্রহ ও সূচীবদ্ধ করে তুলেছিল এই ব্রাহ্মণগুলিতে। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ আচার্য সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল এই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বৈদিক ধর্ম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষার্ধে এই রচনায় বৈদিক ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে অনার্য-ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির আভাসও সুস্পষ্টরূপে বর্তমান। যেমন *কৌষীতকি ব্রাহ্মণ*-এ ঈশানে মহাদেবের উল্লেখ। ষড়্‌বিংশ *ব্রাহ্মণ*-এ বিনাশাত্মক ইন্দ্রজালের ব্যবহার বা 'স্বাহা'-কে দেবীরূপে গণ্য করার প্রচলনটি দেখা যায়। *শতপথব্রাহ্মণ*-এ বৈশবর্ণের মতো উপদেবতা ও পিশাচযোনির উল্লেখও আর্যদের ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার বর্ণনা—এই পরিবর্তন ও সমন্বয়ের দিকটিকে তুলে ধরে। তবে এই ধারাটি সবথেকে বেশি প্রকট অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ গোপথ-এ। এতে সর্পবেদ, পিশাচবেদ, অসুরবেদ, ইতিহাসবেদ ও পুরাণ-এর অন্তর্ভুক্তি এই দিকেরই নির্দেশ করে। পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবনের সঙ্গে অথর্ববেদে ও গোপথব্রাহ্মণের নিবিড় সম্পর্ক থাকার জন্যই—বাস্তব জীবনে উত্তর-ভারতের সমসাময়িক বিভিন্ন সংস্কৃতিগুলির সমন্বয় ও সহাবস্থানের চিত্রটি পরিপূর্ণরূপে উপস্থিত।

## ২গ.৩ ধর্মদর্শন

বৈদিক ধর্মবিশ্বাসে সর্বেশ্বরবাদ বেশি জনপ্রিয় হলেও এই সাহিত্যে একেশ্বরবাদের উপস্থিতি বৈদিক দর্শনের একটি সুচিন্তিত ধারাকে সূচিত করে। *ঋগ্বেদ*-এর চূড়ান্ত পর্যায়ে, দশম মণ্ডলে, সৃষ্টিতত্ত্বের উপস্থাপনা রয়েছে। এরই সঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার কল্পনা রয়েছে যা একেশ্বরবাদে পরিণত হয়েছে। সমগ্র বৈদিক সংহিতা সাহিত্যের মধ্যেও তুলনা করলে দেখা যায়, *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে অনস্তিত্ব থেকে উত্তরণ এবং তৎপূর্ববর্তী সার্বিক শূন্যতার কল্পনায়, দর্শন ও কাব্যিক উৎকর্ষের যে প্রমাণ মেলে তা গভীর। এই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনাতেই পরমশ্রেষ্ঠ স্রষ্টার রূপকল্পনা রয়েছে যা প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মন্, পুরুষ ও পরমাত্মারূপে উপস্থাপিত। পরমস্রষ্টার বিমূর্ত রূপকল্পনা, সৃষ্টির আদিতে মহাশূন্যের উপস্থাপনা এবং সৃষ্টির আদি কণিকারূপে হিরণ্যগর্ভের উদ্ভাসিত রূপকল্প—এসবের মধ্যেই বৈদিক সাহিত্যে ধর্ম থেকে দর্শনে উত্তরণের ধারাটি পরিলক্ষিত। এমনকী, *ঋগ্বেদ*-এ পুরুষ-সূত্র—যা থেকে প্রথম বর্ণ-ভেদের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বলে সচরাচর মনে করা হয়, তা প্রাথমিক ভাবে এক অদ্বিতীয় পুরুষস্রষ্টার রূপ কল্পনা করে তাকে সমস্ত মনুষ্যজগতের উৎপত্তির কেন্দ্রবিন্দুরূপে প্রদর্শন করেছে। পরমাত্মা বা পরমপুরুষের দেহ থেকে জাত মানবসমাজের, পরমাত্মার সাথে একাত্ম-সংযোগের দর্শনটিও এই সূত্রে নিহিত। বিস্তু অন্যদিকে দেহের বিভিন্নাংশ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বর্ণের বিভেদ বর্ণনায় বাস্তবে বৈদিক সমাজের শ্রেণী-ভেদের দিকটিও এই সূত্রে ফুটে উঠেছে।

*ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলে যে দর্শনের উন্মেষ ঘটে তা *আরণ্যক সাহিত্যে*-এও প্রতিধ্বনিত এবং উপনিষদে এই ধারা পরিণতি লাভ করে। আরণ্যক যজ্ঞ প্রক্রিয়া ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাখ্যায় প্রতীকের ব্যবহারে উন্নত চিন্তাধারার প্রকাশ হয়েছে। স্বাধ্যায়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বারা *ঋগ্বেদ সংহিতা*-র আবৃত্তির দ্বারা আত্মজ্ঞান ও সত্যবোধ অর্জনের প্রচেষ্টা, জ্ঞান ও দর্শনের স্তরে উন্নীত। সৃষ্টিতত্ত্ব ও হেতুর অন্বেষণ *আরণ্যক*-এ অব্যাহত থাকে, মানুষ জীবন-মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনে ব্যগ্র ছিল। 'প্রাণ'-এর অর্থে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল অধ্যাত্ম-দর্শন বিকাশের ফলে। *ঐতরেয় আরণ্যক*-এ 'প্রাণ' স্রষ্টার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। এর আরেকটি কারণ ছিল—*অথর্ববেদ সংহিতা*-র সময় থেকে প্রচলিত শারীরবিদ্যা চর্চার বৃদ্ধি। এরই সঙ্গে যুক্ত মৃত্যু ও মরণোত্তর জীবন সম্ভবন্ধে কৌতূহলের উদ্ভব। *তৈত্তিরীয়* ও *শাঙ্খায়ন আরণ্যক*-এ এর আলোচনা পাওয়া যায়। *আরণ্যক*-এ নতুন সৃজনশীল প্রক্রিয়ারূপে জ্ঞানার্জন ও তপস্যার তাৎপর্য বৃদ্ধি পায়। যজ্ঞানুষ্ঠানের যে জনপ্রিয়তা *যজুর্বেদ, অথর্ববেদ* এবং *ব্রাহ্মণ* সাহিত্যে প্রতীয়মান, *আরণ্যক*-এ তার পরিবর্তন ঘটে গেছে।

*আরণ্যক*-এর পরিবর্তিত এই ধারা *উপনিষদ*-এ পরিণতি লাভ করে। *উপনিষদ*-এ যজ্ঞের উপযোগিতা সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটতে দেখা যায়। জ্ঞানলব্ধ পুণ্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে উপনিষদে। এ ছাড়া, মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও অতিলৌকিক অস্তিত্ব, কর্মবাদ ও দেহান্তর গ্রহণ-সম্পর্কেও অধ্যাত্ম-চেতনা ও কৌতূহল লক্ষণীয় *শুক্লযর্জুবেদ*-এর অন্তর্গত *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ প্রাণ, মৃত্যু ও পুরুষের তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে। *সামবেদ*-এর অন্তর্গত *ছান্দোগ্য উপনিষদ*-এ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও অধ্যাত্মবাদী বিবরণ রয়েছে। এই উপনিষদেই সেই মহাবাক্যটি উল্লিখিত যা আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আধ্যাত্মিক সেতু রচনা করেছে—'তৎ ত্বম্ অসি'। আরুণি ও শ্বেতকেতুর সংলাপের মাধ্যমে বৈদিক দর্শনের একটি চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। এই

সংলাপের মাধ্যমে আরুণি-পুত্র শ্বেতকেতুকে অস্তিত্বের চরম সত্য ও সৃষ্টির পরম রহস্য সম্বন্ধে পরিচয় দেন যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছয়। *ঐতরেয় উপনিষদ*-এ সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা, সৃষ্টির পর্যায়ক্রমে ও বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*-এ পরমসষ্টা ব্রহ্মার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান বর্ণিত। এ ছাড়া—জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলিও আলোচিত। উপনিষদের এই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক প্রবণতারই ফসল খৃষ্টপর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সহ বেশ কয়েকটি প্রতিবাদী ধর্মীয় চিন্তাধারার উদ্ভব। সমকালীন সমাজে সাধারণ জীবনে অর্থনীতির প্রসার ও রাজনৈতিক সংগঠনের ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ক্রমে রূপায়িত হচ্ছিল, তারই প্রতিফলন অধ্যাত্ম চেতনায় পরিলক্ষিত।

## ২গ.৪ অনুশীলনী

১। বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বরূপ আলোচনা করুন।

২। পরবর্তী বৈদিক সমাজের ধর্মীয় চিন্তাধারায় সংস্কৃতিগত সংমিশ্রণের রূপটি তুলে ধরুন।

৩। ধর্ম থেকে দর্শন—বিবর্তনের ধারাটি বৈদিক সাহিত্যে কীভাবে পরিলক্ষিত হয়—ব্যাখ্যা করুন।

## ২গ.৫ গ্রন্থপঞ্জী


১। রমেশ মজুমদার ঃ *দ্যা ভেদিক্ এজ্ (১৯৫১)*

২। অবিনাশ চন্দ্র দাস ঃ *ঋগ্‌ভেদিক্ কালচার (১৯২৫)*

৩। রমেশ শর্মা ঃ *মেটেরিয়াল কালচার এ্যান্ড সোশাল ফরমেশন ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৮৩); অ্যাসপেক্ট অফ্ পলিটিক্যাল আইডিয়াস এ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া (১৯৫৯/১৯৬৮)*

৪। ব্রজদেও প্রসাদ রয় ঃ *লেটার বেদিক ইকোনমি (১৯৮৪)*

৫। রোমিলা থাপার ঃ *ফ্রম লিনিএজ টু স্টেট (১৯৯০)*

৬। রনবীর চক্রবর্তী ঃ *অয়ারফেয়ার ফর ওয়েলথ : আর্লি ইন্ডিয়ান পার্‌সপেকটিভ (১৯১২)*

৭। এ. এ. ম্যাকডোনাল ও এ. বি. কিথ ঃ *দ্য ভেদিক্ ইনডেক্‌স্ অফ নেমস এ্যান্ড সাবজেক্টস (১৯১২)*

৮। বি. বরুয়া ঃ *এ হিস্ট্রী অফ্ প্রি বুদ্ধিস্ট ইন্ডিয়ান ফিলোসফি (১৯২১)*

৯। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য ঃ *দ্যা ইন্ডিয়ান থিওগনি (১৯৭৮)*

১০। এন. এন. ভট্টাচার্য্য ঃ *এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান রিচুয়ালস্ এ্যান্ড দেয়ার সোশাল কনটেন্টস (১৯৭৫)।*